মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩১

৬ষ্ঠ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • শাওয়াল-১৪৩৮ • জুলাই-২০১৭



بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক
সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা
শওয়াল-যুলক্বাদ ঃ ১৪৩৮ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবণ ঃ ১৪২৪ বাংলা
জুলাই ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

☆☆ *প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। কর্তৃপক্ষ এর জন্য দায়ী নয়।*

সূচীপত্র — **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

‘নট ইন মাই নেম’

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে নানা জাতি, নানা ধর্ম ও নানা ভাষাভাষির লোক একসঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বেশ কিছু দিন থেকে রাজনৈতিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাতে এক শ্রেণির মানুষ ও নেতা-নেত্রীরা উঠে পড়ে লেগেছে। পরিণতিতে দেশে সর্বত্র নির্বিচারে মুসলিম নিধন চলছে। চলছে হিন্দু মুসলিম বিভাজন করার ঘৃণ্য চক্রান্ত। বিশেষ করে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ চক্রান্ত আরো প্রকট রূপ ধারণ করেছে।

তাই তো দেশে খোঁড়া ও মিথ্যা অজুহাতে মুসলিমদেরকে হত্যা ও খুন করা হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। অকারণে পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে আবার কখনো কখনো অকারণে জেলে বছরের পর বছর কয়েদি বানিয়ে রাখা হচ্ছে। কাউকে হত্যা করা হচ্ছে গো মাংস রাখার অজুহাতে, কাউকে হত্যা করা হচ্ছে গো মাংস বিক্রির অজুহাতে, কাউকে হত্যা করা হচ্ছে গো পাচারের অজুহাতে, কাউকে হত্যা করা হচ্ছে গো মাংস খাওয়ার অজুহাতে, কাউকে হত্যা করা হচ্ছে মৃত গরুর শব নিক্ষেপ করা অজুহাতে, ঈদের বাজার ফেরত মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। চলন্ত ট্রেনে রোজাদার মহিলাকে জোর করে ধর্ষণ করা হচ্ছে। মিথ্যা অজুহাতে আখলাক, উসমান আনসারী, জব্বর খান, জুনাইদদের হত্যা করা হল। মেকি গোরক্ষ বাহিনীর দ্বারা মিথ্যা অজুহাতে মুসলিমদেরকে প্রকাশ্যে গুলি করে ও কুপিয়ে খুন করার ঘটনা প্রতিদিন ঘটতেই আছে। ট্রেনে, বাসে, বিমানে কোথাও নিরাপত্তা নেই। সর্বত্র চলছে গুন্ডারাজ।

চাম্পিয়ানস ট্রফির ফাইনাল ম্যাচের শেষে মিডিয়ায় প্রকাশিত হল যে ভারতের মাটিতে থেকে *‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’* — স্লোগান দেওয়ার অপরাধে মধ্যপ্রদেশে ১৫জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ভারত জুড়ে এমন এক বাতাবরণ তৈরি হল যে, মুসলিমদের ভারতের প্রতি বিন্দুমাত্রও দরদ নেই। কয়েকদিন যেতেই সামনে এল আসল ঘটনা। এন.ডি.টি.ভিকে আমরা ধন্যবাদ জানাই সঠিক ও নির্ভিক খবর পরিবেশন করার জন্য। সুভাস নামক যুবকের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে গেল এটা একটি সম্পূর্ণ বানানো ও মিথ্যা ঘটনা। এসব পক্ষপাত দোষে দুষ্ট পুলিশ ও নেতা মন্ত্রীদের চক্রান্ত। এরকমই বহু ঘটনা মুসলিমদের বদনাম করার জন্য রচনা করা হচ্ছে। অবশ্য ভারতের মাটিতে *‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’* স্লোগান দেওয়াটা যেমন গর্হিত অপরাধ, তেমনি পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগানের নামে অপবাদ দিয়ে মুসলিমদেরকে টার্গেট করাটাও গর্হিত অপরাধ। উভয় প্রকার আচরণেরই আমরা চরম বিরোধীতা করছি।

আর কত দিন এভাবে চলবে অন্যায় ও অবিচার? নির্যাতিতরা কি কখনো পাবে না সঠিক বিচার? নির্যাতিতদের আর্তনাদ কি সরকার বাহাদুরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না? সরকার বাহাদুর কি কখনো এ সব সন্ত্রাসী গোরক্ষবাহিনী ও হিন্দু যুব বাহিনীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেবে না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের শিকার জুনাইদ, আখলাক, জব্বর খান, উসমান আনসারীদের জন্য নিরব কেন? এরা মুসলিম বলেই কি এদের প্রতি এত ঘৃণা ও বিদ্বেষ? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় কি নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ‘সব কা সাথ সব কা বিকাশ’ — এর কথা বিস্মৃত হয়ে গেছেন, না তিনি কেবল নিয়ম রক্ষার খাতিরে এ কথা বলেছিলেন?

সর্বোপরি মিডিয়াগুলিও সঠিক ও সত্য খবর প্রচারে চরম কৃপণতা প্রদর্শন করছে। বেশির ভাগ মিডিয়াই সরকারের তোষামোদ করেই চলছে। ফলে বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদছে। মুখ খুললেই দেশদ্রোহী। আর মুখ না খুললে বুলেটের গুলি। বিচারের কথা বললে সন্ত্রাসী-আতংকবাদী তকমা, পাকিস্তান চলে যাওয়ার নির্দেশ। অথচ একাধিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতারা প্রতিদিন প্রকাশ্যে সংবিধান বিরোধী উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখছে এবং মন্তব্য করছে। আর.এস.এসের সদস্যরা প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সরকার বাহাদুরের প্রচ্ছন্ন মদদেই এসব কাজ সংঘটিত হচ্ছে - তা বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে আর বাকী নেই। তাই তো বুদ্ধিজীবী মহল যথেষ্টই উদ্বিগ্ন। আগামী দিনে হয়ত ভারতে জাতি দাঙ্গা বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিতে পারে, বহু মানুষের হতাহত হতে পারে। তাই আজকের দিনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেকি দেশভক্তদের প্রতিবাদে ভারত জুড়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছে। কলকাতা, যন্তর-মন্তরে এবং দেশের বিভিন্ন শহরে **‘নট ইন মাই নেম’** - ব্যানারে সেই আন্দোলনের ঝলক আমরা দেখতে পাচ্ছি। *“যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে’’* - কবির এ কথা দেশের মঙ্গলের জন্য সকলকেই স্মরণে রাখতে হবে।

হে আল্লাহ্! তুমি দেশে শান্তি ফেরাও, দেশের সার্বিক কল্যাণ কর এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি কর — আমীন।

দারসে কুরআন (কুরআনের পাঠ)

কে বুদ্ধিমান ?

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

যে ব্যক্তি এটা জানে যে যা কিছু আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই হক ও সত্য সে কি ওই ব্যক্তির মতে হতে পারে যে (এ বিষয়ে) অন্ধ ? বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (বুদ্ধিমান লোকেদের বৈশিষ্ট্য সমূহের অনত্যম হল) যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং তা ভঙ্গ করে না। তারা সে সম্পর্ক অটুট রাখে যে পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ আল্লাহ্ প্রদান করেছেন। তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং মন্দ হিসাবের বিষয়ে ত্রস্ত থাকে। তারা শুধুমাত্র তাদের প্রতিপালকের (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টির জন্যই ধৈর্যধারণ করে, স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেছেন তা হতে প্রকাশ্য ও গোপনে দান করে এবং ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। এদের জন্যই তো রয়েছে পরকালে উত্তম পরিণাম। এমন স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে। প্রবেশ করবে তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির মধ্যে তারাই যারা সৎ ও ঈমানদার। ফেরেশতামণ্ডলি প্রতিটি স্বর্গীয় দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবেন এবং তাদেরকে বলবেন (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) যে ধৈর্যাবলম্বন করেছে তার বিনিময়ে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরকালের প্রতিদান কতই না সুন্দর। আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক আল্লাহ্ অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা বিনষ্ট করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে— তাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র লানাত এবং তাদের পরকালের পরিণাম হবে জঘন্যতম (সূরাতুর রা'দ ১৯-২৫)।

মানুষের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যারা নিজেকে চরম বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। অথচ তিনি কীভাবে মানুষ হলেন, তাঁর সৃষ্টিকর্তাই বা কে, কেনই বা তিনি সৃষ্টি হলেন ? এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা তাদের নেই। যারা নিজেকে, তার স্রষ্টাকে, স্রষ্টার বিধানকে, স্রষ্টার ক্ষমতাকে, তার শাস্তিকে জানে এবং সে অনুযায়ী স্বীয় পার্থিব জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, সে ব্যক্তিই হল বুদ্ধিমান। নিজের প্রাপ্ত সম্পদ, লোক-লস্কর ইত্যাদি সত্বেও যে নিজের অনন্ত জীবনকে সুরক্ষিত করতে পারল না তার চাইতে নির্বোধ আর কে হতে পারে ?

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَ مَا وَعٰى وَ تَحْفَظَ الْبَطْنَ وَ مَا حَوٰى وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا حَقَّ الْحَيَاءِ.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ্‌র সামনে প্রকৃতরূপে লজ্জা করো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আমরা, আল্‌হামদুলিল্লাহ্, বাস্তবেই আল্লাহ্‌কে দেখে লজ্জা করি। তিনি বললেন, (তোমরা যে লজ্জার কথা বুঝেছো) সেটা নয়। আল্লাহ্‌র সামনে প্রকৃত লজ্জার অর্থ হল যে, তুমি মাথা এবং মাথার সাথে যুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির ব্যবহার (শরীআত অনুযায়ী) করবে এবং পেট ও পেটের সাথে যুক্ত অঙ্গগুলির ব্যবহার (শরীআতের আইন অনুযায়ী পরিচালনায়) সুরক্ষিত রাখবে। অবশ্যই মৃত্যু ও তৎপরিবর্তিতে মৃত্তিকা সার হয়ে যওয়ার বিষয়টিকে স্মরণে রাখবে। যে ব্যক্তি পারলৌকিক কল্যাণ প্রাপ্তির ব্যাপারে আশাধারী সে যেন পার্থিব (বাহুল্য) সম্ভোগকে পরিহার করে। যে এমনটা করতে পারল সেই প্রকৃত লজ্জাশীল (সহীহুত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ৩৩৩৭)।

উক্ত হাদীসে লজ্জাশীল বলতে আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে এমন ব্যক্তিকেই বুঝিয়েছেন। মাথার সাথে যুক্ত রয়েছে মস্তিষ্ক, চোখ, কান, জিহ্বা।

(১) আল্লাহ্‌র বিধান বহির্ভূত চিন্তা-ভাবনাকারী ব্যক্তি নির্বোধ। কেননা সে আল্লাহ্‌র চাইতে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, অথচ ভুলে যাওয়া ও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে একাধিকবার পরিকল্পনার পরিবর্তন মানুষের প্রকৃতি। মহান স্রষ্টার কথায় কোনো পরিবর্তন নেই (সূরাহ্ ক্ব-ফ ২৯)। তাঁর সৃষ্টি তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন নেই (সূরাহ্ রূম ৩০)। সুতরাং একজন বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টিকর্তার বিধানের ভিত্তিতেই নিজের বুদ্ধির বিকাশ তরান্বিত করবে। তিনি যা ভাবতে নিষেধ করেছেন তা ভাবা যাবে না বরং বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই স্রষ্টাকে জানতে হবে।

(২) ও (৩) চোখ ও কান এমন দুটি অঙ্গ যেগুলো দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানার্জন সহজতর হয়। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মও দু'য়ের সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। একজন দৃষ্টিহীন ও বধির ব্যক্তি সীমিত কিছু কাজ করতে পারলেও তাদের কষ্ট সহজেই অনুমেয়। যে মূল উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ অঙ্গদ্বয়কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র সে কাজেই তাদের ব্যবহার সুনিশ্চিত করাটা বুদ্ধিমান ব্যক্তির দায়িত্ব। স্রষ্টার নিষেধাজ্ঞাকে পাত্তা না দিয়ে পর্ণোগ্রাফীর দর্শন ও অশ্লীল বাক্যালাপ ও কাব্যের শ্রবণ নির্বোধ ব্যক্তির পরিচায়ক। অনুরূপ এ অঙ্গদ্বয়কে শুধু পার্থিব সফলতা অর্জনে ব্যবহারকারীও বুদ্ধিমান নয়। কেননা যে কোনো সময় মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ অপব্যবহারের দন্ডাদেশ হেতু সে সব শক্তি রহিত করে দিতে পারেন (সূরাতুত্ দাহ্‌র, ২৮)। কান ও চোখের ডাক্তারের ছড়াছড়ি এরই প্রমাণ।

(৪) জিহ্বার দ্বারা কথা বলা হয় ও জীবন ধারণের জন্য পানাহার এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। যে কথাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট একমাত্র সেই কথাগুলিই বলতে হবে। আর রসনাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে এমন পানাহার দ্বারা যার অনুমোদন আল্লাহ্‌র বিধানে আছে।

(৫) পেটের সাথে যুক্ত আছে যৌনাঙ্গ। পেটে অবৈধ কোন দ্রব্যের প্রবেশ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, মানুষ পেটের মত জঘন্য কোনো পাত্র পূরণ করে না (তাহ্‌কীক কৃত রিয়াযুস স্বলিহীন, ৫২১ হাদীস সহীহ্)। অর্থাৎ এটা একটা পাত্র তাতে অবৈধ খাদ্য খোরাক ও জঘন্য বস্তু রাখা ইসলামে হারাম।

এ যাবৎ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট যে, মানুষ সম্মানিত সৃষ্টি। তার সম্মান ততক্ষণ অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ সে তার স্রষ্টার আইনের নাগাল হতে নিজেকে মুক্ত করবে না। যদি সে নিজেকে মুক্ত ভাবে ও ইচ্ছামত চলে, তাহলে মহান বিচারক আল্লাহ্ নিজের বিচার কার্যকরী করবেন। কেননা তাঁর বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ নেই। ইচ্ছামত যদি কোনো ব্যক্তি চলে ও আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান আহরণের বব্যস্থা থাকা সত্বেও স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হয়, তাহলে সে যে চতুস্পদ জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট সে কথা আল্লাহ্ সূরাহ্ আ'রাফে বর্ণনা করেছেন (আয়াত নং ১৭৯)।

হে আল্লাহ্! আমরা যেন তোমার নীতি অনুযায়ী বুদ্ধিমান হতে পারি ও পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারি, সে তাওফীক আমাদের দান করো — আমীন।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

মুক্তির উপায়

মোহাঃ আতাউর রহমান সালাফী

عَـنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَ لْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ

উকবা বিন আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুক্তির উপায় কী?' তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, 'তোমার জিহ্বাকে (তোমার কল্যাণের জন্য) আয়ত্বে রাখো, তোমার বাড়ি যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তোমার অপরাধের জন্য ক্রন্দন কর'' (তিরমিযী, জিহ্বার সংরক্ষণ অধ্যায়, হাদীস নং ২৪০৬, সহীহ্ জামিউস সাগীর ১৩৯২, সিলসিলা সহীহা ২৮৬১)।

একজন মানুষকে ইহজগত ও পরজগতে সমস্যা মুক্ত রেখে সফলতা প্রদান করাই হল ইসলামী বিধানের মূল লক্ষ্য। ফলে বিপদ ও সমস্যা আগমনের সকল সম্ভাবনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ক্ষেত্রেও নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যা মেনে চললে একজন মানুষ উভয় জগতে সকল প্রকার বিপদমুক্ত হয়ে সফল হতে পারবে। এমনি বিধানের মধ্যে বাহ্যত সুক্ষ্ম ও আমাদের দ্বারা অবহেলিত হলেও পরিণামের দিক দিয়ে তিনটি বৃহৎ বিধান এ হাদীস দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি এর উপর আমল করতে সক্ষম হই, তবে অবশ্যই অবশ্যই অনুভব করব অনাবিল শান্তি ও সুখ এবং পরকালেও লাভ করব জান্নাত ইন্শা-আল্লাহ্।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, ''মুক্তির উপায় কী?'' তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উত্তরে তিনটি কথা বলেন— (১) জিহ্বা আয়ত্বে রাখা, (২) বাড়িকে প্রশস্ত মনে করা এবং (৩) অপরাধের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্রন্দন করা।

সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রশ্নে এটা স্পষ্ট নেই যে, তিনি পার্থিব না পরকালীন বিপদ ও সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় জানতে চেয়েছিলেন। তিনি সাধারণভাবে প্রশ্ন করেন, 'মুক্তির উপায় কী?' কিন্তু উভয় জগতের নেতা নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে এমন অর্থবহ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন যে, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় বিপদ ও সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় সন্নিবিষ্ট করে দেন।

(১) ''তোমার জিহ্বাকে তোমার কল্যাণের জন্য আয়ত্বে রাখো'' অর্থাৎ যা তোমার জন্য কল্যাণকর নয় সে রকম কথা বলা হতে বিরত থাকো। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ''মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে'' (৫০/১৮)। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির কল্যাণকর কথা বলা উচিৎ অন্যথায় চুপ থাকা উচিৎ'' (বুখারী ৬০১৮, মুসলিম ৭৪)। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরো বলেন, ''ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে, ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য'' (তিরমিযী ২৩১৫, হাদীস হাসান)।

আমরা সাধারণতঃ বিনোদন প্রেমী। সর্বদাই আমোদ প্রমোদের জন্য কোনো না কোনো কথা বলেই চলি। আবার বহু সময় আমোদ ফুর্তি না হলেও কিছু বলতে হবে তাই বলেই চলি, কিংবা অপরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে ফালতু কথাতো বটেই মিথ্যার প্রলেপ চড়িয়ে থাকি। ভেবে দেখিনা কোন্টি আমাদের জন্য কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়, আর কোন্টি অকল্যাণকর ও অপ্রয়োজনীয়। যা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় তা অবশ্যই বলতে হবে, কিন্তু যার প্রয়োজন নেই তা বলা হতে বিরত থাকতে হবে সে দিকে লক্ষ্য রাখি না। অপ্রয়োজনীয় কথা বলার ফলে নিজের আমলনামা যেমন ভারী হয়, তেমনি বহু সময় এমন অবাঞ্ছিত কথা আমরা বলি যার ফলে বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়। ভেঙে চুরমার হয় আত্মীয়তা বন্ধন। ফলস্বরূপ পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নেয় বিদায়। অপর দিকে গীবত বা অপবাদ দ্বারা বান্দার অধিকার হরণ হওয়ার ফলে ক্ষমা গ্রহণ না হয়ে থাকলে পরকালে বিচার দিবসেও মুক্তির ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াবে অন্তরায়। কাজেই নিঃসন্দেহে ইহ-পারলৌকিক মুক্তির উপায় নিহিত রয়েছে জিহ্বাকে আয়ত্ব রাখার মধ্যে। জিহ্বাকে আয়ত্ব রাখার জন্য আরো দুটি বিষয় রয়েছে, তা হলো মিথ্যা কথা ও গালি বকা। এ বিষয় দুটি শরীয়তে তো হারাম বটেই মানব রচিত নিয়মেও আন্তর্জাতিকরূপে অপরাধের।

(২) মুক্তির উপায় হিসাবে দ্বিতীয় বিষয়টি নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমার গৃহ তোমার জন্য যেন প্রশস্ত হয়''। কারো গৃহ তার জন্য সংকীর্ণ না হয়ে প্রশস্ত হওয়ার অর্থ হল উপার্জনের উদ্দেশ্যে যতটুকু সময় বাইরে থাকা দরকার এবং অসুস্থ ব্যক্তির দর্শন, জুমআহ, জামাআত, দ্বীন প্রচার কিংবা দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাইরে অবস্থান ব্যতীত অন্য সময় নিজ গৃহে অবস্থান

করতে হবে। এমনকী পাঁচ অক্ত স্বলাতের আগে ও পরে নফল স্বলাতও গৃহে আদায় করাই অধিক উত্তম। বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে অবস্থান করার অর্থই হল বাড়ি যেন সংকীর্ণ, অবস্থানের জন্য যথেষ্ট বা প্রশস্ত নয়। এ বিষয়টির মাধ্যমেও ইহ-পারলৌকিক মুক্তি লাভ করা যায়। বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে অবস্থান করার ফলে ক্যারাম, তাস, লুডু ইত্যাদি হারাম কাজে কিংবা এমনি সময় যেমন অপচয় হয় তেমনি সেই সময় অতিবাহিত করতে গিয়ে বিড়ি, সিগারেট, মদ, জুয়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন অর্থেরও অপচয় হয়। শুধু তাই নয় গীবত, পরনিন্দা ও ব্যাভিচারের মতো হারাম কাজও মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। বিনা প্রয়োজনে অবসর সময় বাইরে কাটানোর জন্য চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে গিয়ে চা পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ইনসাফ নামক বিষয়টিকে ভেঙে করে দেয় চুরমার। কেবলমাত্র বাড়ির গার্জেন কিংবা ছেলেরাই চা পান করে। চা পানের যদি প্রয়োজনই থাকে তবে নিজের অর্ধাঙ্গিনী ও একজন মানুষ যাদের গার্জেন তাদের বাদ দিয়ে কেন? চায়ের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার জন্য যদি চা পান করা হয়, তবে অর্ধাঙ্গিনী সহ অন্যদের বঞ্চিত করা কী ধরণের ইন্সাফ? বিষয়টি একজন মুমিনের ভেবে দেখা উচিৎ। অবসর সময়ে বাড়িতে অবস্থান করতে অভ্যস্ত হলে একগুচ্ছ হারাম থেকে বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব তেমনই একাই চা পান করে বেইন্সাফী হওয়া থেকেও বাঁচা সম্ভব। অপরদিকে বিনা প্রয়োজনে অবসর সময় বাড়ির বাইরে কাটানোর ফলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে অনেকের যেমন বিচ্ছেদ ঘটে তেমনই বিচ্ছেদ না ঘটলেও সংসার নামক স্বর্গ নরকের রূপ ধারণ করে। পিতাকে বিনা প্রয়োজনে বাইরে সময় কাটাতে দেখে ছেলেও তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। যেহেতু ছেলে পিতার দোষে দুষ্ট তাই ছেলেকে আয়ত্ব করতে না পারার ফলে বিভিন্ন অপকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে একদিন ছেলে হয়ে উঠে সম্পূর্ণরূপে বেআড়া। পিতা তখন হতাশায় ভোগেন, করার কিছুই থাকে না। অপরদিকে যারা ছোটো হওয়ার দরুন বাইরে সময় কাটানোর উপযোগী নয়, তারা পিতার আদর থেকে বঞ্চিত তো হয়ই যত্নমুক্ত হওয়ার ফলেও বাড়িতে বেআদবী করার সুযোগও দীর্ঘায়িত হয়। কাজেই একজন মুমিন বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে সময় নষ্ট না করে বাড়িতে অবস্থান করে সময়কে কাজে লাগিয়ে যিক্র আয্কার, কুরআন পাঠ, নফল ইবাদাত কিংবা অর্ধাঙ্গিনী ও সন্তানাদির সাথে দ্বীন চর্চা বা খোশ আলাপ করে আদব কায়দা শেখাবে এটাই শরীআত সম্মত নিয়ম। এর ফলে যেমন নিজের দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে, তেমনই বহু অন্যায় অপরাধ স্বাভাবিক ভাবেই বিদায় নিয়ে নেমে আসবে সংসারে শান্তি। যখন কারো দ্বারা দায়িত্ব পালন ও অন্যায় থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে তখন পরকালীন মুক্তিও অবশ্যাম্ভাবী ইন্শাআল্লাহ্।

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানকে যতক্ষণ না পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে স্বীয় প্রভুর নিকট থেকে পা তুলতে পারবে না —(১) বয়স কীসে খরচ করেছে, (২) যৌবন কোথায় নষ্ট করেছে, (৩/৪) সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় খরচ করেছে এবং (৫) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে" (তিরমিযী ২৪১৬, সিলসিলা সহীহা ৯৪৬, সহীহ্ জামিউস সাগীর ৭২৯৯, হাদীস হাসান)।

(৩) মুক্তির উপায় হিসাবে তৃতীয় বিষয়টি নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমার কৃত অপরাধের জন্য ক্রন্দন করো" অর্থাৎ ক্রন্দনের মাধ্যমে অনুশোচনা প্রকাশ করো।

মানুষের দ্বারা অপরাধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অপরাধ হওয়ার পরেও যদি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করা হয় তবে তা হবে অহংকার যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। অপরদিকে ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে তার থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করলে মিলবে অনাবিল শান্তি। অপরাধ থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কৃত অপরাধের জন্য ক্রন্দনের মাধ্যমে অনুশোচনা প্রকাশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। ক্রন্দন করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাআলা শুধু ক্ষমা করে দেন তাই নয়, বরং পূর্বের অপরাধকে পূণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন। আল্লাহ্ বলেন, ''আল্লাহ্ তোমাদের তাওবা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন (৪/২৭)। যে ব্যক্তি অত্যাচারের পর (চুরি করার পর) তাওবা করে ও আমলকে সংশোধন করে নেয় আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু (৫/৩৯)। (কিন্তু) যে ব্যক্তি তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তার পাপ পরিবর্তন করে দেবেন পূণ্যে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু "(২৫/৭০)।

যদি কোনো মানুষ অপরাধ মার্জনার জন্য ক্রন্দন করে আল্লাহ্র কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করতে শেখে, তবে তার দ্বারা পুনরায় পাপ হওয়ার সকল পথ স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে। একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইহজগতে পরিতৃপ্তি অনুভব করে আর পরজগতে রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভ।

হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর শিক্ষা স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ণের তাওফীক দান করে ইহ-পারলৌকিক মুক্তি দান করো (আমীন)।

৩২ পর্ব

بَابُ الْحَيْضِ ❶ وَ النِّـفَاسِ

হায়েয ও নেফাসের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছদ

হায়েযের মাসায়েল

হায়েযের সব থেকে কম ও সব থেকে বেশি সময়কালের নির্দিষ্ট হওয়া সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য কোনও দলীল নেই এবং এ রকমই পবিত্র হওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময়কাল নেই ❸ ।	لَمْ يَأْتِ فِى تَقْدِيرِ أَقَلِّهِ وَ أَكْثَرِهِ مَا تَقُومُ ❷ بِهِ الْحُجَّةُ وَ كَذَالِكَ الطُّهْرُ.

❶ **শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ** এর অর্থ প্রবাহিত হওয়া এবং মাসিকের রক্ত প্রবাহিত হওয়া। حيض শব্দটি حَاضَ يَحِيضُ অর্থাৎ ضَرَبَ يَضْرِبُ বাবের মাসদার এবং এই রকমই مَحِيضٌ শব্দটিও একই বাবের মাসদার। কুরআনে রয়েছে,

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ـ البقرة : ٢٢٢ মানুষেরা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।[১]

শারয়ী ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ এমন রক্ত যা নারীদের গর্ভাশয় থেকে সন্তান প্রসব ব্যতীত বা সুস্থ অবস্থায় বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর নির্দিষ্ট দিনে নির্গত হয়।[২]

মাসিকের রক্তের রঙ ঃ ফকীহদের ঐক্যমতে মাসিকের রক্তের রঙ হল কালো, লাল, হলুদ এবং মেটে (অর্থাৎ সাদা এবং কালোর মাঝামাঝি)।[৩]

(আলবানী রহঃ) — এ কথাই বলেছেন।[৪]

মাসিকের সময় ঃ মাসিকের জন্য কম বা বেশি কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই।[৫]

১। ফাতহুল বারী ১/৬৩১, আল্ কামুসুল মুহীত ৫৭৬, আল মুনজিদ ১৮৯।

২। আনীসুল ফুকাহা পৃঃ ৬৩, আল ইখতেয়ার ১/২৬, আল ফিকহুল ইসলামী অ আদিল্লাতুহু ১/৬১০, তাহযীবুল লুগা ৫/১৫৮, লিসানুল আরাব ৩/৪১৯।

৩। ফাতহুল কাদীর মাআ হাশিয়াতুল এনাইয়াহ্ ১/১১২, আল লুবাব ১/৪৭, আশ্ শারহুস সাগীর ১/২০৭, মুগনীল মুহতাজ ১/১১৩, হাশিয়াতুল বাজুরী ১/১১২, কাশ্শাফুল কানা ১/২৪৬, বাদায়েউস সানায়ে ১/৩৯।

৪। তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১৩৬।

৫। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমা ১/২৬৬।

❷ **শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ** نِفَاسٌ শব্দটি نَفِسَ يَنْفُسُ (سَمِعَ) বাবের মাসদার। এর অর্থ হল সন্তান প্রসব করা বা ঋতুবতী হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর বহুবচন হল نُفَسَاءُ ।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ এমন রক্ত যা (প্রসবের সময়) সন্তানের সঙ্গে বা প্রসবের পরে নির্গত হয়।[২]

❸ **এই মসলাতে ফকীহদের মত পার্থক্য রয়েছে ঃ—**

(আহনাফ) — মাসিক কমপক্ষে তিন দিন এবং সব থেকে বেশি ১৫ দিন থাকতে পারে।

(মালেকিয়া) — ন্যূনতম কোনো সময় নেই। অবশ্য সব থেকে বেশি দিন বিভিন্ন নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম এবং তা চার ধরণের হয় — مُبْتَدَأَةٌ (১৫ দিন), مُتَعَادَّةٌ (৩ দিনের থেকে বেশি), হামেলা (২০ দিন) এবং مُخْتَلَطَةٌ (১৫ দিন)

(শাফেইয়্যাহ, হাম্বেলী) — মাসিকের ন্যূনতম সময় হল একদিন একরাত এবং অধিকাংশের সময় হল ৬ বা ৭ দিন এবং সব থেকে বেশি সময় হল ১৫ দিন এবং ১৫ রাত।[৩]

طُهْرٌ বা পবিত্রতার সংজ্ঞা ঃ যে সময় নারী হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র থাকে, সেই সময়কে তুহ্র বা পবিত্র বলে।[৪]

তুহরের সময়কাল ঃ এর সময়কাল সম্পর্কে ফকীহদের মত পার্থক্য রয়েছে —

(জমহুর) — তুহ্রের ন্যূনতম সময় হল ১৫ দিন আর বেশির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। কেননা অনেক সময় এক বছর বা দু বছর পর্যন্ত তুহ্র প্রলম্বিত হয়।[৫]

(হানাবেলা) — তুহরের ন্যূনতম সময় হল ১৩ দিন এবং সব থেকে বেশি সময়ের বিষয়ে ফকীহদের ঐক্যমতে কোনও নির্ধারিত সময় নেই।[৬]

রাজেহ বা তুলনামূলক বেশি সঠিক ঃ হায়েযের ন্যূনতম ও সর্বাধিক সময় সম্পর্কে কোনও অকাট্য দলীল নেই। বরং এ বিষয়ে যত সব দলীল পেশ করা হয় সেগুলি মাওযূ বা জাল অথবা যঈফ।[৭] কখনো নির্দিষ্ট অভ্যাস অনুযায়ী হায়েয হওয়া বিষয়টি জানা যায়, কখনো রক্ত দেখে জানা যায় বা আবার কখনো নির্দিষ্ট সময় ও রক্ত উভয় বিষয় দেখেই জানা যায়[৮] এবং এ রকমই তুহ্রেরও কোনও নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই।

১। আল কামূসুল মুহীত পৃঃ ৫৩৪, আল্ মুনজিদ পৃঃ ০১৩।

২। আনীসুল ফুকাহা ৬৪।

৩। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৪৮, আল্ কাওয়ানিনুল ফিক্হিয়্যাহ্ পৃঃ ২৯, বাদায়েউস সানায়ে ১/২-৮, আদ্দুরুল মুখতার ১/২৬২, ফাত্হুল কাদীর ১/১১১, মুগনিল মুহতাজ ১/১০৯, হাশিয়াতুল বাজুরী ১/১১৪, আল্ মুগনী ১/৩০৮, কাশ্শাফুল কানা ১/২৩৩।

৪। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/২৫, আল্ কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ পৃঃ ৪১।

৫। আল্ মুহায্যাব ১/৩৯, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৪৮, ফাত্হুল কাদীর ১/১২১, মারাকাল ফালাহ্ পৃঃ ২৪, আশ্ শারহুস সাগীর ১/২০৯, মুগনিল মুহতাজ ১/১০৯, হাশিয়াতুল বাজুরী ১/১১৬।

৬। কাশ্শাফুল কানা ১/২৩৪।

৭। আস্ সাইলুল জাররার ১/১৪১, আর্ রাওযাতুন নাদিয়্যা ১/১৮৪।

৮। নাইলুল আওতার ১/৩৯৬, আল্ মুগনী ১/১১৩, আল্ ইফসাহ্ ১/১০৬, আল মাজমূ ২/৪৫৫, বাদায়েউস সানায়ে ১/৪১।

যেসব মহিলাদের হায়েযের দিন নির্দিষ্ট থাকে, তারা সেই অনুযায়ীই আমল করবে ❶ ।	فَذَاتُ الْعَادَةِ الْمُتَقَرَّرَةِ تعْمَلُ عَلَيْهَا.

❶ (ক) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফাতেমা বিনতে আবী জাইশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন ইস্তিহাযায় পীড়িত হওয়ার কথা ব্যক্ত করলেন, নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন,

فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَ إِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى.

যখন তোমার হায়েয হবে, তখন স্বলাত ছেড়ে দেবে, আর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত পরিস্কার করে পুনরায় স্বলাত পড়বে।[১]

(খ) উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে —

لتنتظر عَدَدَ اللَّيَالِى وَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِى اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ.

ইস্তিহাযায় পীড়িত হওয়ার পূর্বে মহিলারা যে রাত ও দিনগুলিতে হায়েযওয়ালী হতেন (ইস্তিহাযা পীড়িত হয়ে) সমসংখ্যক রাত ও দিন প্রত্যেক মাসে স্বলাত ছেড়ে দেবে।[২]

(গ) যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইস্তিহাযা পীড়িত মহিলাদের সম্পর্কে বলেন — تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ইস্তিহাযা পীড়িত মহিলা হায়েযের দিনগুলিতে বসে থাকবে (অর্থাৎ পবিত্রা মহিলাদের মত স্বলাত, সিয়াম পালন করবে না)।[৩]

(ঘ) উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকটে ইস্তিহাযা ব্যাধীর রক্ত সম্পর্কে জানতে চান। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — اُمْكُثِى قَدْرَ مَا تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى. যতদিন তুমি হায়েযের কারণে (স্বলাত, সিয়াম ইত্যাদির জন্য) অপেক্ষা করতে, ততদিন অপেক্ষা কর অতঃপর গোসল কর[৪] (অতঃপর রক্ত এলেও স্বলাত, সিয়াম পালন করতে থাক — অনুবাদক)।

১। বুখারী ৩০৬, কিতাবুল হায়েয : বাবুল ইস্তিহাযা, মুসলিম ৩৩৩, আবূ দাউদ ২৮২, নাসায়ী ১/১২৪, তিরমিযী ১২৫, ইবনু মাজাহ্ ৬২১, ইবনু আবী শাইবা ১/১২৫, আব্দুর রায্যাক ১১৬৫, আবূ আওয়ানাহ্ ১/১৩৯।

২। সহীহ্ : সহীহ্ নাসায়ী ৩৪৩, আবূ দাউদ ২৭৪, কিতাবুত তাহারাত : বাবু ফিল মারআতে তাসতাহাবু .... মুআত্তা ১/৬২, আহমাদ ২/২৯৩, নাসায়ী ১/১৮২, ইবনু মাজাহ্ ৬২৩, দারেমী ১/১৯৯, দারাকুতনী ১/২১৭, বাইহাকী ১/৩৩৩।

৩। সহীহ্ : সহীহ্ নাসায়ী ৩৪৯, আবূ দাউদ ২৭৬, নাসায়ী ৩৬১, কিতাবুল হাইযে অল ইস্তিহাযা : বাবু জামইল মুস্তাহাযাতে বাইনাস সলাতাইনে অ গাসলিহা ইযা জামাআত।

৪। মুসলিম ৩৩৪, কিতাবুল হায়েয : বাবুল মুস্তাহাযাতে অ গাসালিহা অ সলাতেহা, আহমাদ ৬/২৩৭, দারেমী ১/১৯৮, শারহু মাআনিল আসার ১/৯৮, নাসায়ী ১/১৮১।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেসব মহিলার মাসিকের দিনগুলি নির্দিষ্ট, তারা সেই সংখ্যক দিন পূর্ণ করে নিবে (ইস্তিহাযা পীড়িত মহিলারা মাসিকের দিনগুলি পূর্ণ করে নিয়ে গোসল করবে এবং বাকী সময়ে স্বলাত, সিয়াম, সহবাস সমস্ত আমল পবিত্রা নারীদের মতই আমল করবে — অনুবাদক)।

এবং যার হায়েযের দিন নির্দিষ্ট নয়, সে লক্ষণের প্রতি নজর রাখবে ১ ।	وَ غَيْرُهَا تَرْجِعُ اِلَى الْقَرَائِنِ

১ (ক) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, ফাতেমা বিনতে আবী জাইশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইস্তিহাযায় পীড়িত ছিলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকে বলেন —

اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَامْسُكِى عَنِ الصَّلَاةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِ وَ صَلِّى.

নিশ্চয় হায়েযের রক্ত কালো রঙের হয়, যা চেনা যায়। যখন এরকম রক্ত থাকবে, তখন স্বলাত থেকে দূরে থাকবে এবং যখন অন্য ধরণের রক্ত আসবে, তখন অযূ করে স্বলাত সম্পাদন করবে।[১]

(খ) অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে —

فَاِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضَ اَوْرَكْضَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ اَوْ عِرْقٌ اِنْقَطَعَ.

নিশ্চয় এটি একটি সংক্রামিত রোগ বা শয়তানের খোঁচা বা কেটে যাওয়া শিরা (প্রকাশ থাকে যে, এ বর্ণনা ইস্তিহাযার রক্ত সম্পর্কেই বলা হয়েছে।)[২]

১। হাসান : সহীহ্ আবূ দাউদ ২৬৩, কিতাবুত ত্বাহারাত : বাবু ইযা আকবালাতিল হায়যাতু তাদাউস স্বলাত, আবূ দাউদ ২৮৬, নাসায়ী ১/১৮১, ২১৬।

২। সহীহ্ : আত্ তালীকাতুর রাবিয়্যা আলার রাওযুন্ নাদিয়্যা ১/২১৩, দারাকুতনী ১/২০৬, বাইহাক্বী ১/২৪৪, হাকিম ১/১৭৫।

১৫ পর্ব

বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী

মূল ঃ সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান

ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

বিবিধ ১০টি

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ (উপাস্য) নেই এ কথার (কালিমার) ফযীলত

١٠١ ــ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا؟ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ يَارَبِّ. فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ : بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَاِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُـهٗ فَيَقُوْلُ : اَحْضِرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ فَقَالَ : اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ قَالَ : فَتُوْضَعُ السِّجِلاَّتُ فِىْ كَفَّةٍ وَ الْبِطَاقَـةُ فِىْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَ ثَقُلَتِ الْبِطَاقَـةُ فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَيْئٌ.

১০১। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝ থেকে আল্লাহ্ আমার এক উম্মতকে বিচারের জন্য তাঁর সামনে হাজির করবেন। তারপর তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামা খুলে ধরা হবে। প্রতিটি আমলনামাই দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। তারপর তাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন : এর কোনো কিছু কি তুমি অস্বীকার কর ? আমার বিশেষ (নির্ধারিত) নির্বাচিত লেখকগণ কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে ? তখন লোকটি বলবে : না, হে আমার প্রভু ! তখন আল্লাহ্ বলবেন : তবে কি তোমার এর জন্য কোনো ওজর আছে ? লোকটি তখন বলবে : না, হে আমার প্রভু ! আল্লাহ্ তখন বলবেন : হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার জন্য একটি নেক আমল আছে। তার প্রতিদান আমি তোমাকে দিব। কেননা, আজ তোমার প্রতি (এবং কারো প্রতি) কোনো জুলুম করা হবে না। তারপর আল্লাহ্ এক টুকরো কাগজ বের করবেন। তাতে লেখা থাকবে — ‘‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল (প্রেরিত পুরুষ)।’’ আল্লাহ্ তখন বলবেন : তুমি তোমার এ কাগজের ওজন কর। তখন লোকটি বলবে : হে আমার প্রভু ! এসব বিশাল বিশাল (নিরানব্বইটি) নথি পত্রের তুলনায় এ ছোট কাগজের টুকরোটির কি-ই বা ওজন আছে ? তখন আল্লাহ্ বলবেন : তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না।

এরপর নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : এরপর (নিরানব্বইটি বিশাল বিশাল) আমলনামাকে একপাল্লায় ও সেই ছোট টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। তখন আমলনামাসমূহ হালকা হবে ও ছোট্ট টুকরাটি ভারী হবে। কেননা, আল্লাহ্র নামের চেয়ে কোনো কিছুই বেশি ভারী নয় (সহীহ্ হাদীস : তিরমিযী ৬৯৯৪, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ)।

নোট : এ হাদীসে সংক্ষেপে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র তাওহীদ ও মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নবুওয়াত বিশ্বাসীকে আল্লাহ্ তাআলা চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন — সে যতই পাপী হোক না কেন। তবে এর অর্থ এ নয়

যে, এ হাদীসকে অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র রহমতের ওপর নির্ভর করে (প্রত্যেকেই) স্বেচ্ছায় পাপ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারা যাবে। যে প্রকৃত মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় আছে তার উচিৎ কুরআন-হাদীসের বিধান মোতাবেক আমলে সালেহ করা ও পাপ কাজ পরিহার করা।

তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন

١٠٢ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) قَالَ دَخَلَ قُلُوْبَهُمْ مِنْهَا شَىْءٌ، لَمْ يَدْخُلْ قُلُوْبَهُمْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ سَلَّمْنَا) قَالَ : فَاَلْقَى اللّٰهُ الْاِيْمَانَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ (رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ (وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ.

১০২। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন এ আয়াত নাযিল হলো : তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৪)।

তখন সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অন্তরে এমন উদ্বিগ্নতা দেখা দিল যা পূর্বে কখনও দেখা দেয়নি। তখন নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : তোমরা বল, আমরা শুনলাম, মানলাম ও আত্মসমর্পণ করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান সঞ্চারিত করলেন এবং আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : আল্লাহ্ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না। সে যে ভাল কাজ করবে তার সুফল পাবে, আর যে মন্দ কাজ করবে তার কুফল সে ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

সাহাবীগণ যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন : আমি তা-ই (কবুল) করলাম। এরপর আল্লাহ্ আরো নাযিল করেছেন : হে আমাদের প্রভু, আর আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেরূপ বোঝা চাপিয়ে ছিলেন আমাদের ওপরে সেরূপ বোঝা চাপাবেন না। সাহাবীগণ যখন একথার পুনরাবৃত্তি করলেন তখন আল্লাহ্ বললেন : আমি তাই করলাম। সাহাবীগণ আবার বলল, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৬)।

বর্ণনাকারী বলেন : সাহাবীগণ যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন তখন আল্লাহ্ বললেন : আমি কবুল করলাম (সহীহ্ হাদীস : মুসলিম ও তিরমিযী ২৯৯২)।

١٠٣ – عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ) قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا : اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ الْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ، وَ قَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَ لَا نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ

سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا؟ بَلْ قُوْلُوْا (سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَلَمَّا اقْتَرَاَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ اِثْرِهَا) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ، كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ اَوْ اَخْطَاْنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ) قَالَ : نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) قَالَ : نَعَمْ.

১০৩। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ওপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ - আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নিবেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন আর যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৪)।

বর্ণনাকারী বলেন : এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এক ব্যক্তি এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল : হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের ওপর স্বলাত, সিয়াম, জিহাদ, সদকা (যাকাত) যা কিছু চাপানো হয়েছে তা আমরা করতে সক্ষম। কিন্তু আপনার প্রতি এ আয়াত নাযিল হয়েছে, আমরা এর ওপর আমল করতে অক্ষম (কেননা, আমাদের মনের উপর, কল্পনার উপর আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই)। তখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী ইহুদী-খৃষ্টানগণ যেমন বলেছিল - আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম - তোমরা কি তেমনটি বলতে চাও? বরং তোমরা বল : আমরা শুনলাম এবং মানলাম; হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৫)।

তখন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন : আমরা শুনলাম এবং মানলাম; হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৫)।

সাহাবীগণ যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করল তখন তাদের জিহ্বা এ আয়াতের প্রভাবে কোমল হয়ে গেল। এরপর আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন : রসূলের প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তিনি তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও এর প্রতি ঈমান এনেছেন। প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মাঝে পার্থক্য আরোপ করিনা (অর্থাৎ তাঁদের মাঝ থেকে কোনো একজনকে রসূল মনে করিনা - এমন নয়; বরং তাঁদের সকলকেই রসূল মনে করি) এবং তাঁরা বলেছেন : আমরা শুনলাম এবং হে আমাদের প্রভু, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৫)।

যখন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতকে (অর্থাৎ এ আয়াতের বিধানকে) রহিত করে দিলেন এবং এর স্থানে নাযিল করলেন : আল্লাহ্ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না। সে যে নেক আমল করবে তার সুফল ভোগ করবে আর যে সে বদ আমল করবে সে তার কুফল ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সাহাবীগণ যখন এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : হে আমাদের প্রভু! আর আপনি আমাদের ওপর

আমাদের সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। তখন আল্লাহ্ বললেন : ঠিক আছে, তাই হবে। এরপর সাহাবীগণ যখন নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ওপর অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতের পুনরাবৃত্তি করলেন :আর আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফেরদের ওপর আপনি আমাদেরকে বিজয়ী করুন (সূরা বাক্বারাহ্, আয়াত ২৮৬)। তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন : ঠিক আছে, তাই হবে (সহীহ্ হাদীস, মুসলিম ৩৪৪)।

নোট : তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারীগণই বলত : আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম। কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উম্মতদেরকে বলতে বলা হয়েছে; আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। হে প্রভু, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং কুরআনের আদেশ ও নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীসের প্রতি প্রকৃত মুসলিমের অনুগত থাকা উচিৎ।

আরাফাতের দিনের ফযীলাত সেদিন আল্লাহ্ হাজীদের নিয়ে গর্ব করেন

١٠٤ ــ عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَـا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَ اِنَّهُ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ : مَا اَرَادَ هٰؤُلاَءِ.

১০৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আরাফাতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সবচেয়ে বেশি বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। সেদিন তিনি ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হয়ে গর্ব করে বলেন : এরা কী চায়! (এরা আমার সন্তুষ্টি চায়, তাই এদেরকে ক্ষমা করে দিলাম) (অন্য হাদীসের কারণে এ হাদীসটি সহীহ্, মুসলিম ১৩৪৮)।

١٠٥ ــ عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَـا مِنْ اَيَّامٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ عَشَرِذِىْ الْحِجَّةِ ، قَالَ فَـقَـالَ رَجُـلٌ : يَـا رَسُـوْلَ الـلّٰـهِ هُنَّ اَفْضَلُ اَمْ عَدَدُهُنَّ جِهَـادًا فِـىْ سَبِـيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : هُنَّ اَفْضَلُ مِنْ عَدَدِهِنَّ جِهَـادًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَـوْمِ عَـرَفَةَ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَـبَارَكَ وَ تَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْـيَا فَيُبَـاهِـىْ بِـاَهْـلِ الْاَرْضِ اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَـادِىْ جَـائُـوْا شُـعْثًا غُبْرًا حَاجِّيْنَ جَائُوْا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَـمِيْـقٍ يَـرْجُـوْنَ رَحْمَتِىْ وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِىْ، فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

১০৫। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন হলো আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম দিন। বর্ণনাকারী বলেন : তখন একজন সাহাবী বলেন : হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এ দশ দিন উত্তম না-কি আল্লাহ্র রাস্তায় দশ দিন জিহাদ করা উত্তম ? তখন নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন : আল্লাহ্র রাস্তায় দশ দিন জিহাদ করার চেয়ে এ দশ দিন উত্তম। আরাফাতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম দিন। সে দিন আল্লাহ্ তাআলা নিকট (দুনিয়ার) আকাশে অবতরণ করেন। এরপর পৃথিবীবাসীদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের নিকট গর্ব করে বলেন : আমার বান্দাদেরকে দেখ, তারা এলোকেশে, ধূলি মেখে হজ্জ করতে এসেছে, অথচ তারা আমার শাস্তি দেখেনি (কিন্তু তারা আমার শাস্তির ভয়ে এসেছে)। সুতরাং আরাফাতের দিনে সবচেয়ে বেশি লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

(অন্য হাদীসের কারণে এটি একটি হাসান হাদীস, এটিকে যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বানে বর্ণনা করা হয়েছে।)

২য় পর্ব

অযূতে ঘাড় মাসাহ্ করা সুন্নাত নাকি বিদ'আত

আহমাদুল্লাহ্

দলীল - ৪ :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ مِنْ مُقَدَّمِ عُنُقِهِ.

ত্বালহা বিন মুসার্রিফ তাঁর পিতা হ'তে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেখেছি, তিনি মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করতেন। এমনকী তিনি 'ক্বাযাল' পর্যন্ত হাত পৌঁছাতেন। 'ক্বাযাল' হ'ল ঘাড়ের অগ্রভাগ হ'তে মাথার শেষ ভাগ (শারহু মা'আনিল আসার হা/১২৯)।

পর্যালোচনা : এটি যঈফ নিম্নোক্ত কারণে —

(১) এর সনদে 'লায়স বিন আবী সুলায়েম ' নামী রাবী আছেন। ইমাম মুসলিম রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে মুহাদ্দিসদের বরাতে মাজহূল (অর্থাৎ যঈফ) বলেছেন (সহীহ্ মুসলিম, ভূমিকা ১/৫, আরবী পাঠ- .(وَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوْا ذٰلِكَ مِنْ عَطَاءٍ؛ وَ يَزِيْدَ، وَ لَيْثٍ)।

(২) ইবনুল জাওযী রাহেমাহুল্লাহ্ 'লায়স'-কে যঈফ বলেছেন (আত্-তাহক্বীক্ব ফী মাসাইলিল খিলাফ হা/১৩১৫)। তিনি তাঁকে যঈফ এবং পরিত্যক্ত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আয-যু'আফাউ অল মাতরূকীন, রাবী নং ২৮১৫)।

(৩) আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্তান রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, وَ لم يكن بِالْحَافِظِ، وَ هُوَ صَدُوْقٌ ضَعِيْفٌ তিনি (হাদীসের) হাফেয ছিলেন না এবং তিনি সত্যবাদী, যঈফ (বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ফী কুতুবিল আহকাম ৫/২৯৫)।

(৪) ইবনে আব্দুল হাদী রহেমাহুল্লাহ্ রচিত 'তানক্বীহুত তাহক্বীক্ব' গ্রন্থে তাঁকে দুর্বল বলা হয়েছে (তানক্বীহ্ ৩/২৩৪, আরবী পাঠ وذاك مع حفظه قد ضعّف)।

(৫) و ليث هو ابن ابى سليم ضعفه البيهقى আর লায়স হ'লেন ইবনু আবী সুলায়েম। বায়হাক্বী তাকে যঈফ বলেছেন (ইবনুত তুরকুমানী হানাফী, আল- জাওহারুন নাক্বী ১/ ২৯৮)।

(৬) যায়লাঈ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, مُتَكَلَّمٌ فِيْهِ তাঁকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে বা তিনি বির্তকিত (নাসবুর রায়াহ ২/৪৭৫)। وَ هُوَ ضَعِيْفُ الْحَدِيْثِ তিনি যঈফুল হাদীস তথা যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী (ঐ, ৪/৩৩০)।

(৭) হাফেয হায়সামী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, وَ هُوَ ثِقَةٌ، وَ لَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু মুদাল্লিস রাবী (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬৩৬৪)।

(৮) ضَعَّفَهُ الجمهور জমহুর বিদ্বানগণ তাকে যঈফ বলেছেন (ইবনুল হাজার আসক্বালানী, ইতহাফুল মাহরাহ্ হা/ ২৭৬০)। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك তিনি সত্যবাদী। (তার) মস্তিষ্ক ভীষণভাবে পরিবর্তন হয়ে হয়েছিল। তার হাদীসকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যায় নি, তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৬৮৫)।

(৯) 'মা'রিফাতুত তাযকিরাহ' গ্রন্থে তাকে যঈফ বলা হয়েছে (রাবী নং [illegible])।

(১০) ইমাম নাসাঈ রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে যঈফ এবং পরিত্যাজ্য রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আয-যু'আফাউ অল মাতরূকীন, রাবী নং ৫১১)।

(১১) ইবনে আদী রাহেমাহুল্লাহ্ তার সম্পর্কে একাধিক নির্ভরযোগ্য ইমামের 'জার্হ' (সমালোচনামূলক বক্তব্য) লিপিবদ্ধ করেছেন (আল-কামিল, রাবী নং ১৬১৭)।

(১২) ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন,

وَ كَانَ مِنَ الْعباد وَ لَكِن اخْتَلَطَ فِي آخر عمره حَتَّى كَانَ لا يَدْرِي مَا يحدث به فكان يقلب الأسانيد

তিনি ইবাদাত গুযার ছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে মস্তিষ্ক

খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমনকী তিনি বুঝতেন না কী বর্ণনা করেছেন। আর তিনি সনদসমূহ উলট পালট করে ফেলতেন (আল-মাজরুহীন, রাবী নং ৯০৬)।

(১৩) হাফেয ইবনে শাহীন রাহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে যঈফ এবং মিথ্যুকদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (তারীখে আসমাউয যু'আফা ওয়াল কায্যাবীন, রাবী নং ৫৩১)।

(১৪) হাফেয যাহাবী রাহেমাহুল্লাহ্ 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে তার একাধিক 'জারহ্' তুলে ধরেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ তাঁকে 'মুযত্বারিবুল হাদীস' (অসংগতিপূর্ণ হাদীস বর্ণনাকারী) বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া এবং নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনে মাঈন বলেছেন, তাকে নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার শেষ জীবনে হিফয বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি (নং ৬৯৯৭)। তবে তিনি কোনো সনদ উল্লেখ করেননি।

(১৫) ইবনে হাজার আসক্বালানী তাকে মুদাল্লিসদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসিন নং ১৬/১৬৮)।

(১৬) ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে যঈফ বলেছেন (তারীখে ইবনে মাঈন, দারেমীর বর্ণনা, রাবী নং ৭২০)।

(১৭) আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে যঈফ বলেছেন (সিলসিলাহ্ সহীহা হা/২৫৪)।

(১৮) জাওযাজানী বলেছেন, ليث بن أبى سليم يضعف حديثه ليس بثبت লায়স হ'লেন ইবনে আবী সুলায়েম। তার হাদীসকে দুর্বল বলা হয়। তিনি মজবুত রাবী নন (আহওয়ালুর রিজাল, রাবী নং ১৩২)।

এ বর্ণনার অপর রাবী ত্বালহার বাবা মুসার্রিফ একজন মাজহূল রাবী। যেমন - নাসিরুদ্দীন আলবানী ত্বালহার বাবা মুসার্রিফকে মাজহূল বলেছেন (যঈফ আবূ দাউদ হা/১৫)। ইবনে হাজার আসক্বালানী লিখেছেন,

مصرف ابن عمرو ابن كعب أو ابن كعب ابن عمرو اليـامى الكوفى روى عنه طلحة ابن مصرف مجهول من الرابعة.

মুসার্রিফ বিন আমর বিন কা'ব অথবা কা'ব বিন আমর আল-ইয়াম্মী আল-কূফী। তার থেকে ত্বালহা বিন মুসার্রিফ বর্ণনা করেছেন। তিনি চর্তুথ স্তরের মাজহূল রাবী (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৬৮৫)।

অতএব এই রেওয়ায়াতটি আমল ও দলীলের উপযুক্ত নয়।

দলীল - ৫ : ওয়ায়েল বিন হুজুর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ثُمَّ مَسَحَ رَقَبَتَهُ অতঃপর তিনি তাঁর ঘাড় মাসাহ্ করলেন (আল্ মু'জামুল কাবীর হা/১১৮)।

পর্যালোচনা : এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। এ হাদীসে বুকের উপর হাত বাঁধা, আমীন জোরে বলা এবং রুকূ'র আগে এবং পরে রফ'উল ইয়াদায়েনেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এতগুলি সুন্নাত বাদ দিয়ে কেবল ঘাড় মাসাহ করার অংশটুকু (যা স্পষ্ট বিদ'আত) গ্রহণ করার বিষয়টি বেধগম্য নয়। 'মুসনাদুল বায্যার'-এ একটি রেওয়ায়াত আছে। তাতে তিনবার ঘাড় মাসাহ্ করার কথা আছে (হা/৪৪৮৮, وَ مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ وَ بَاطِنَ لِحُيَتِهِ ثَلَاثًا)। অথচ মুক্বাল্লিদগণ তিনবার ঘাড় মাসাহ্ করেন না।

এই সনদটি অত্যন্ত যঈফ। এতে মুহাম্মাদ বিন হুজর নামী রাবী আছেন যিনি যঈফ। তার সম্পর্কে মনীষীগণ নিম্নোক্ত অভিমত পেশ করেন —

(১) হাফেয হায়সামী বলেছেন—

رَاوَهُ الـطَّبَـرَانِىُّ فِى الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْـجَبَّـارِ، قَـالَ الـنَّسَـائِىُّ : لَيْسَ بِالْقَوِىِّ، وَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّـانَ فِى الثِّقَاتِ، وَ فِى سَنَدِ الْبَزَّارِ وَ الطَّبَرَانِىِّ مُحَمَّدُ بْنُ حَجَرٍ، وَ هُوَ ضَعِيفٌ.

এটি ত্বারারানী 'আল-কাবীর' গ্রন্থে এবং বায্যার বর্ণনা করেছেন। আর এতে (এর সনদে) সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার আছেন। নাসাঈ বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। ইবনে হিব্বান একে তাঁর 'আছ-ছিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বায্যার ও ত্বাবারানীর সনদে মুহাম্মাদ বিন হুজুর আছেন যিনি যঈফ (মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১১৭৮)।

(২) মুহাম্মাদ বিন হুজরকে ইমাম উক্বায়লী যঈফ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন (আয-যু'আফা, রাবী নং ১৬১০)।

(৩) ইমাম মুগলাত্বাঈ রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, **و محمد ضعيف** এবং মুহাম্মাদ হলেন যঈফ (শরহে ইবনে মাজাহ্ পৃঃ ১৩৮২)।

(৪) ইমাম আব্দুর রহমান মোবারকপুরী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, **مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ وَ هُوَ ضَعِيْفٌ** মুহাম্মাদ বিন হুজর যঈফ (তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৭ দ্রঃ)।

(৫) ইমাম বুখারী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, তাকে নিয়ে আপত্তি আছে (আত্ তারীখুল কাবীর, রাবী নং ১৬৪)।

(৬) ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে সমালোচিত রাবীদের মাঝে উল্লেখ করেছেন (আল্ মাজরূহীন, রাবী নং ৯৬২)।

(৭) ইবনে আদী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, **فيه نظر** (তার) ক্ষেত্রে আপত্তি আছে (আল্ কামিল, রাবী নং ১৬৪৮)।

(৮) ইবনুল জাওযী রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে যঈফ এবং পরিত্যক্ত রাবীদের মাঝে উল্লেখ করেছেন (আয্ যু'আফাউ অল মাতরূকীন, রাবী নং ২৯৩২)।

(৯) হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, **لَهُ مَنَاكِير** তার কতিপয় মুনকার বর্ণনা আছে (আল্ মুগনী, রাবী নং ৫৩৯২; মীযানুল ইতিদাল, রাবী নং ৭৩৬১)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, **محمد بن حجر بن عبد الجبار الحضرمی، لين** মুহাম্মাদ বিন হুজর বিন আব্দুল জাব্বার আল্ হাযরানী একজন দুর্বল রাবী (আল্ মুক্বতানা ফী সারদিল কুনা, রাবী নং ১০৭০)।

(১০) 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে আছে —

"محمد" بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن عمه سعيد و عنه ابراهيم بن سعيد الجوهری له مناكير قيل كنيته أبو الخنافس و قال البخاری فيه بعض النظر انتهى و الكنية المذكورة نقلها بن عدی عن ابن حماد عن ابراهيم بن سعيد الجوهری و هذا سند صحيح فما أدری لم يرضاه و قال أبو حاتم كوفی شيخ و قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوی عندهم يكنى أبا بكر ويقال أبو جعفر.

মুহাম্মাদ বিন হুজর বিন আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল বিন হুজর ... তার কতিপয় মুনকার বর্ণনা আছে। বলা হয়, তার উপনাম হ'ল আবুল খানাফুস এবং বুখারী বলেছেন, তার মাঝে কতিপয় সমস্যা আছে। উপরোল্লিখিত তার উপনামটি ইবনে আদী ইবনে হাম্মাদ হ'তে, তিনি ইবরাহীম বিন সাঈদ জাওহারী হ'তে বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদটি সহীহ। আমি জানি না কেন তিনি তার উপর সন্তুষ্ট? আবূ হাতেম বলেছেন, তিনি কূফী শায়খ। আবূ আহমাদ হাকেম বলেছেন, তিনি তাঁদের কাছে শক্তিশালী নন (রাবী নং ৪০১)।

(১১) আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে যঈফ বলেছেন (আস সামারুল মুসতাত্বাব পৃঃ ৪৭৮)।

অপর আরেকজন রাবী 'সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার'। তার সম্পর্কে ইমামদের উক্তিসমূহ নিম্নরূপ - শায়েখ আলবানী (মৃ: ১৯৯৯ ইং) রাহেমাহুল্লাহ্ তাকে যঈফ বলেছেন (আস্ সামারুল মুসতাত্বাব পৃঃ ৪৭৮)। ইমাম নাসাঈ রাহেমাহুল্লাহ বলেছেন, **سعيد بن عبد الجَبَّار من ولد وَائِل بن حجر لَيْسَ بِالْقَوِيّ** সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার ওয়ায়েল বিন হুজরের পুত্র। তিনি শক্তিশালী নন (আয্ যু'আফাউ অল মাতরূকীন, রাবী নং ২৬৫)। ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন **سعيد ابن عبد الجبار ابن وائل الحضرمی الكوفی ضعيف.** সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামী কূফী হলেন যঈফ (তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৩৪৪)।

আরেকজন রাবী হলেন উম্মে ইয়াহ্ইয়া। তার আসল নাম উম্মে আব্দুল জাব্বার। তার সম্পর্কে আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ লিখেছেন, وأم عبد الجبار، هی : أم يحيى، لم أعرف حالها، و لا اسمها উম্মে আব্দুল জাব্বার হলেন উম্মে ইয়াহ্ইয়া। আমি তার জীবনী ও নাম জানতে পারিনি (সিলসিলাহ্ যঈফা হা/৪৪৯)।

অতএব এর সনদে একাধিক ত্রুটিযুক্ত রাবী থাকায় এটি অত্যন্ত যঈফ।

দলীল - ৬ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍ و الْيَامِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي مُصَرِّفُ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَبْلُغُ بِهِ كَعْبَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ لِحْيَتِهِ وَ قَفَاهُ.

কা'ব বিন আমর বলেছেন, আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেখেছি তিনি অযূ করলেন। এরপর তিনি তা দাঁড়ির অভ্যান্তরভাগ এবং ঘাড় মাসাহ করলেন (আল মুজামুল কাবীর হা/৪১২, ১৯/১৮১)।

পর্যালোচনা : এটি অপরিচিত সনদে বর্ণিত বিধায় প্রত্যাখ্যাত। আল-ইরাক্বী রাহেমাহুল্লাহ্ উল্লেখ করেন, قَالَ عبد الْحق هَذَا الْإِسْنَاد لَا أعرفهُ আব্দুল হক্ব বলেছেন, এই সনদটি আমি চিনি না (যায়লু মীযানিল ইতিদাল, রাবী নং ৬৮৯)। ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন,

قال عبد الحق فى الأحكام الكبرى لا أعرفه بهذا الاسناد و ما كتبته حتى أسأل عنه قال ابن القطان هو اسناد مجهول مسخ و مصرف بن عمرو بن السرى و أبوه وجده السرى لا يعرفون.

আব্দুল হক 'আল-আহকামুল কুবরা' গ্রন্থে বলেছেন, আমি এই সনদটি চিনি না। আর আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা পর্যন্ত কিছু লিখতাম না। ইবনুল কাত্ত্বান বলেছেন, এই সনদটি অস্বাভাবিক মাজহূল (রাবী নং ১৬৪)। সুতরাং মাজহূল সনদে বর্ণিত কোন রেওয়ায়াত গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এটি যঈফের অন্তর্ভুক্ত।

জীব মাত্রই মরণশীল

মহম্মদ শব্দর আলী

জন্ম মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলি সংঘটিত হওয়ায় মানুষের কোনো হাত নেই। সব আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে। কে কোন জায়গায় জন্ম নিবে, কীভাবে জন্ম গ্রহণ বা মরণ ঘটবে তা কেউ জানে না। জন্ম ও মৃত্যু এমনকী পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয় সব কিছুরই সুইচ তাঁরই হাতে। আল্লাহ্ বলেন, ''তাঁরই সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরই হাতে এবং তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে'' (২৪:৪৪)। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, ''ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমাময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (সত্তা)'' (৫৫:২৬-২৭)। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ ছাড়া সবই ধ্বংসশীল। তিনি ব্যতীত পৃথিবীর কোনো কিছু চিরস্থায়ী নয়। জীব মাত্রই মরণশীল। যার জীবন বা প্রাণ আছে সেই হল জীব। মানুষের জীবন আছে অতএব মানুষ মরণশীল। বিশ্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে আল্লাহ্ তাআলা জীব্রাইল (আলাইহিস সালাম) মারফৎ মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আল্লাহ্ বলেন, ''নিশ্চয় তুমি মরবে এবং তারাও মরবে'' (৩৯:৩০)। আল্লাহ্ ব্যতীত পৃথিবীর কোনো কিছু চিরস্থায়ী নয়। দুনিয়ার সব পরাক্রমশালী রাজা-রাণী, বাদশাহ-ফকির, জ্বিন-মানব সবাইকে একদিন মরতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো কিছুই চিরস্থায়ী থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি, যত সব ভোগ সামগ্রী সবই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। অপরদিকে আখেরাত অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহ্র আনুগত্য না করে থাকলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমরা জেহাদ করো বা না করো যেখানেই থাকো সেখানেই মৃত্যু অবধারিত এবং নির্দ্ধারিত সময়ে আসবে। আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদের নাগালে পাবেই যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর'' (৪:৭৮)। মৃত্যুর স্বাদ সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ায় বিভিন্ন কাজকর্মে লিপ্ত মানুষ মরণের কথা ভুলে যায়। সেই ফাঁকে শয়তান সুযোগ ছাড়ে না তাকে দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়। সেইজন্যই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমরা বেশি বেশি করে স্বাদ বিনিষ্টকারী বস্তুটির কথা স্মরণ কর'' (তিরমিযী হা/২৩০৭,

নাসাঈ হা/১৮১৪, ইবনে মাজাহ্ হা/৪২৫৮)।

দুনিয়ার খেল-তামাশায় ব্যস্ত না হয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হওয়া উচিত। মৃত্যুর পর জীবন দাতার সামনে আসামীর ন্যায় হাজির করা হবে। সেখানে জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। হিসাব শেষে ভাগ্যবান ও হতভাগ্য দুই শ্রেণিতে ভাগ হবে। ভাগ্যবানদের জন্য জান্নাত এবং হতভাগাদের জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত হবে। তারা সেখানে শান্তি বা শাস্তি ভোগ করবে চিরকাল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মানুষ ছিলেন বলে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁকেও দাফন করা হয়েছে; নিঃসন্দেহে বলা যায় কবরে তাঁকে (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পৃথিবীর মত জীবন দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ বলেন, ‘‘জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান কর হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেস্তে প্রবেশ লাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয় (৩:১৮৫)। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যু ধ্রুব সত্য এ থেকে কারো রেহায় নেই। ভাল মন্দ সে যে কাজ করুক না কেন সে মোতাবেক পরকালে প্রতিদান দেওয়া হবে। প্রকৃত সফলতা অর্জন করবে সে যে দুনিয়াতে থাকাকালীন স্বীয় প্রতিপালকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে ও যার ফলস্বরূপ তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে করে জান্নাতে প্রবেশ করে দিয়েছে। পার্থিব জীবন ধোকার জীবন ধোকার সম্পদ। এ ধোকা থেকে যে নিজকে বাঁচিয়ে নিতে পারবে সেই ভাগ্যবান। আর যে ধোকার জালে ফেঁসে যাবে সেই হবে হতভাগ্য।

মহান আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া দুনিয়ায় কোনো কাজ হয় না। আল্লাহ্ বলেন, ‘‘আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেই জন্য একটা নির্দ্ধারিত সময় রয়েছে ....’’ (৩:১৪৫)। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, ‘‘.... অতঃপর যখন তাদের (মরণের) সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না’’ (১৬:৬১)। দুনিয়া পাগলদের ভোগ বিলাসে মত্ত না থেকে পরকালের জন্য কিছু সংগ্রহ করে কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। দুনিয়ার ভোগ বিলাস ক্ষণস্থায়ী, আখেরাত অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। ইহকালে অল্প সময় কটিয়ে সত্তর কবরে দাফন করা হবে। পরকালে তার আমলনামা ব্যতীত কিছুই সঙ্গে যাবে না। যথাযথভাবে ঈমান ও আমাল দেখাতে না পারলে কষ্টে পড়তে হবে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল কোন মুমিন উত্তম? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘যে সর্বোত্তম চরিত্রবান।’’ লোকটি বলল, ‘‘কে সর্বাধিক জ্ঞানী?’’ তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘ মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীণ সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী তারাই হল প্রকৃত জ্ঞানী’’ (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৪২৫৯)।

মরণ থেকে যখন রেহাই নেয় তখন উত্তম আমলনামা বা শেষ পরকালের পুঁজি নিয়ে পরকালে যেতে হবে। ফেরেস্তারা তার আমলনামা সামনে রেখে বলবে এটা হল তোমাদের কর্ম তালিকা। এই কর্ম তালিকার আলোকে বিচার ফায়সালা করা হবে। আমলনামার ফলে কারো আগুন খোরাক হবে আবার কেউ জান্নাতের সুবাস গ্রহণ করবে। কেউ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ফেরেস্তার প্রচণ্ড হাতুড়ি পেটা খাবে, কেউ জান্নাতি সুগন্ধিত নববিবাহের ন্যায় সুখ নিদ্রায় ঘুমিয়ে যাবে। কারোর কবর সংকীর্ণ হয়ে দুই পাশ চেপে ধরে পিষ্ট করবে। আবার করোর কবর প্রশস্ত হয়ে আলোকিত হবে।

দুনিয়ার মানুষকে সাবধান হওয়া উচিৎ, জীব হয়ে যখন জন্ম গ্রহণ করেছি, তখন মৃত্যু একদিন হবেই হবে। কাজেই, সেই দিনকে লক্ষ্য রেখে সঠিক আমলনামা নিয়ে যাতে কবরে যেতে পারি সেদিকে আমাদের সকলের একান্তই যত্নবান হওয়া উচিৎ।

হে আল্লাহ্! সকল মুসলিম নরনারীকে সঠিক আমলনামা প্রাপ্তির জন্য সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন — আমীন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত লেখক/লেখিকাগণ সরল পথ পত্রিকায় লেখা পাঠাতে চান তারা এই ই-মেল- **sfprintersbld@gmail.com** এ লেখা পাঠিয়ে এই নম্বরে **9434531957** অবশ্যই ফোন করে জানাবেন।

ইসলামে অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার

মহঃ সাবলুল হক

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলার জন্য যিনি সমগ্র জগৎ এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি অতিশয় মহান, অতিশয় দয়ালু। সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে সবচেয়ে সুন্দর অবয়ব দিয়ে। সেই সঙ্গে তাকে দান করেছেন সর্বোত্তম জ্ঞানবুদ্ধি- বিবেক। তবে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে বড় যে নেয়ামাত দান করেছেন তা হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম যা বিজ্ঞানময় এবং মহান কল্যাণকর এক জীবন বিধান। এই ইসলাম শুধু যে মুসলিমদের ধর্ম তা কিন্তু নয়, বরং সারা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য এই ধর্মের পৃথিবীতে আগমন। এতে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে।

অবশ্য বহু অমুসলিম ইসলামকে ভুল বুঝে থাকে যে, ইসলামে অমুসলিমদের অবমাননা করা হয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করার বিধান আছে। কিন্তু এসবই হচ্ছে কল্পনা প্রসূত গল্পসদৃশ এবং ইসলাম-বিদ্বেষীদের প্রচারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে।

বস্তুতপক্ষে, ইসলাম এবং ইসলামই সবার জন্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন, ''অতএব তুমি একমুখী হয়ে নিজেকে দ্বীনের (ধর্মের) ওপর কেন্দ্রীভূত কর। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর, যার ওপর আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নাই। এটাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না'' (৩০:৩০)।

বিখ্যাত আরব কবি আল মুতানাব্বি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় ইসলামের কল্যাণের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন, ''যদি আলোকে তার নিজস্ব অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বলা হয় তাহলে কীই বা বলার থাকে।'' বস্তুতপক্ষে, বাজারে গল্পে কান না দিয়ে বা দূর থেকে ইসলামকে না দেখে কাছ থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে মানবজাতির কল্যাণের জন্য এর অত্যুজ্জ্বল প্রভা উন্মোচিত হবে।

আমরা সহজেই এটা দেখতে পাব যে, অমুসলিমদের জন্য ইসলাম সংরক্ষিত করেছে বিশেষ বিশেষ অধিকার। মুসলিমরা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় বা যুদ্ধে জয়লাভের পর অমুসলিমদের প্রতি যে অবিশ্বাস্য সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ঐতিহাসিক পেট্রিয়ার্ক গাইশো এ ব্যাপারে স্বীকার করেছেন যে, তারা (মুসলিমরা) আমাদের সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন এবং আমাদের গীর্জা ও আশ্রয়সমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট মন্তব্য করেছেন : 'উমাইয়াহ্ শাসনকালে খ্রিস্টান, ইহুদী, অগ্নি উপাসক প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত যা বর্তমান যুগে খ্রিস্টান শাসিত দেশে পাওয়া যায় না।' এর মূলে আছে ইসলামের দুটি মৌল নীতি। এর একটি হল মানবিক মূল্যবোধ এবং অপরটি হল বিশ্বাসের স্বাধীনতা। ইসলাম শুধু তার অনুসরণকারীদের জন্যই আইন প্রণয়ন করে না, বরং অমুসলিমদের বহুবিধ মর্যাদা ও সাধারণ অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

উক্ত প্রসঙ্গে আল্ কুরআন ঘোষণা করেছে : 'নিশ্চয়ই আমি বানি আদমকে (মানুষকে) সম্মানিত করেছি। আর আমি তাদেরকে দিয়েছি নানাবিধ উত্তম জীবিকা এবং আমি তাদেরকে মর্যাদা দান করেছি আমার বহু সৃষ্টির ওপর' (সূরা ইসরা ১৭:৭০)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা মানবজাতিকে ইসলামের মাধ্যমে উন্নত স্তরে উন্নীত করেছেন যাতে তার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা যায়, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। ইসলাম এ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে যে, মানব জাতির সূচনা একই উৎস থেকে। অতএব সমগ্র মানব জাতির অধিকারও সাধারণভাবে সমপর্যায়ের হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন, ''হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার' (আল্ হুজুরাত ৪৯:১৩)।

অমুসলিমদের চিন্তা ভাবনা-আদর্শ কিংবা তাদের বাক্-স্বাধীনতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তোমরা কিতাবধারীদের সঙ্গে তর্ক করবে না, উত্তম পন্থা ছাড়া। তবে তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘন করে (তাদের সাথে করতে পার) এবং বল : আমরা বিশ্বাস করি আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাকেও, আর আমাদের ইলাহ্ আর তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তো তারই প্রতি অনুগত' (সূরা আনকাবুত ৩৯:৪৬)।

ইসলাম অমুসলিমদের কতটা মর্যাদা দেয় সে ব্যাপারে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে : একদিন এক ইহুদীর লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তা দেখে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দাঁড়িয়ে যান। সাহাবাগণ এ ব্যাপারে আপত্তি

জানিয়ে বলেন, এ তো এক ইয়াহুদীর মৃতদেহ। তখন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, সে কি মানুষ নয়?

এবারে একটি অবিশ্বাস্য ও অভুতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনার কথা শুনুন :

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সময় মিশরের গভর্ণর ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। একবার তাঁর এক ছেলে মুহাম্মাদ মিশরীয় এক অমুসলিমকে চাবুক দিয়ে প্রহার করছিল আর বলছিল : 'জানো আমি কে? আমি এক মহৎ ব্যক্তির সন্তান।' এর পরের ঘটনা নিম্নরূপ :

উক্ত মিশরীয় অমুসলিম তার ফরিয়াদ জানানোর জন্য বহু চড়াই উৎরাই পথ-ঘাট অতিক্রম করে সুদূর মদিনায় এসে উপস্থিত হয় এবং খলিফা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে আব্দুল্লাহ্‌র পুত্রের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। খলিফা তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ্ ও তার পুত্রকে মদিনায় তলব করেন। তারা পিতা-পুত্র মদীনায় এলে খলিফা ওই প্রহৃত মিশরীয়ের হাতে চাবুক দেন এবং দোষী গভর্ণর পুত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বলেন। ওই মিশরীয় তখন সবার সামনে গভর্ণরের পুত্রকে প্রহার করতে থাকে। এইভাবে খলিফার ন্যায় বিচারের ফলে একজন সাধারণ অমুসলিম এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার পুত্রের বিরুদ্ধে নিজ হাতে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়। এ এক অকল্পনীয় ঘটনা। বিস্ময়ে ভরা ঘটনার এখানেই শেষ নয়। প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হলে সবাইকে অবাক করে দিয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'এ চাবুকটি নাও এবং এবার আমার খালি পিঠে প্রহার করতে থাক। তোমার কষ্টের কারণ তো তোমাদের ওপর আমার কর্তৃত্বের কারণেই।' বিশ্বাস করা যায়? একজন মুসলিম রাষ্ট্রপতি এক সাধারণ অমুসলিম প্রজার মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য, তার মানবাধিকার রক্ষার জন্য যা যা করছেন তা কেবল রূপকথার গল্পেই সম্ভব। কিন্তু রূপকথার গল্পকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছেন ইসলামি শিক্ষায় অনুপ্রাণিত মুসলিমরা। যাই হোক, মিশরীয়টি বলল, 'আমি আপনার বিচারে সন্তুষ্ট।' উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'তুমি যদি আমাকে প্রহার করতে তাহলে তা হতে বিরত থাকতে আমি তোমাকে বলতাম না। আর হে আব্দুল্লাহ্! তুমি কবে থেকে এলাকাবাসীকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছ? মনে রেখো, তারা স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।'

ইসলাম অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা দান বা সুবিচার প্রদানের পাশাপাশি তাদের ধর্মাচরণের নিরাপত্তাও দান করেছে। সেজন্য ইসলামে ধর্মীয় ব্যাপারে জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ। মুসলিম শাসকরা তাঁদের অধীনস্ত প্রজাদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেননি। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আর আপনার রব যদি চাইতেন, তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত। তবে কি আপনি মানুষের ওপর বলপ্রয়োগ করবেন যাতে তারা ঈমানদার হয়ে যায়? (সূরা ইউনুস, ১০:৯৯)।

আমাদের রসূল মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা তাদের পূর্ব ধর্মে অটুট থাকার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করেছিলেন। যুদ্ধগামী সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, 'একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধে বের হও... যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যাও, তবে প্রতারণা করবে না অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কারও অঙ্গহানি করবে না, এবং শিশুদের হত্যা করবে না। .... প্রতিপক্ষ শত্রুদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদেরকে জিজিয়া কর প্রদান করতে বলবে : যদি তারা রাজি হয় তাহলে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। ' আল্ কুরআনের শিক্ষা অনুরূপ। আর এটা হল কুরআনের সেই আয়াত যার সম্পর্কে আমেরিকার প্রথিতযশা পণ্ডিত এডউইন ক্যালগারি এক প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন : 'পবিত্র কুরআনে একটি অতি উত্তম আয়াত রয়েছে যা সত্য ও বিচক্ষণতায় পরিপূর্ণ.....। অন্যদের এ বাক্যটি সম্পর্কে জ্ঞানায়ত্ব করা উচিৎ। তাতে বলা হয়েছে যে, ধর্ম অনুসরণের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি করা যাবে না।' এতে প্রমাণিত যে, জোর করে ধর্মান্তরিত করার কোনো অনুমতি ইসলামে নেই।

এমনকী কোনো পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের এক্তিয়ার নেই সন্তানদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা। অনুরূপভাবে সন্তানদেরও কোনো এক্তিয়ার নেই যে, পিতা-মাতাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সময় জেরুজালেমের ইলিয়াবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল সে ব্যাপারে এবার জানাচ্ছি : 'আল্লাহ্‌র বান্দা এবং ঈমানদারদের নেতা উমারের পক্ষ থেকে ইলিয়াবাসীদের প্রতি এই নিরপত্তা প্রদান করা হচ্ছে যে, তাদের জীবন, তাদের স্থাবর-আস্থাবর সম্পত্তি, তাদের গীর্জা এবং তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কযুক্ত তা সে সুস্থ থাকুক অথবা অসুস্থ থাকুক, তাদের গোত্রের সকলে নিরাপত্তার অধীনে থাকবে। বলপূর্বক তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা হবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত করাও হবে না।' এখানেই শেষ নয়, মুসলিম শাসকগণ খ্রিস্টানদের গীর্জাকে সংরক্ষিত

রেখেছেন এবং সংস্কারের মাধ্যমে তা ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে, জেরুজালেমের একটি দেয়াল ইয়াহুদিদের আরাধনা করার একটি পবিত্রতম স্থান বলে গণ্য করা হয়, যা ময়লা আবর্জনার স্তূপে ঢেকে গিয়েছিল। উসমানিয়া খিলাফতকালে খলীফা সুলতান সুলাইমান তা দেখতে পেয়ে জেরুজালেমের প্রশাসককে ওই ময়লা-আবর্জনার পাহাড় সরিয়ে এলাকাটি পরিস্কার করার নির্দেশ দেন যাতে ইয়াহুদীরা এ স্থানে নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে রয়েছে এক পরম পরমতসহিষ্ণুতা। এ ব্যাপারে গুস্টার লিবনের ভাষ্য শুনুন : ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানদের প্রতি মুহাম্মাদের সহনশীলতা ছিল সত্যিই অপরিসীম। তার ধর্মের বিপরীতে, বিশেষ করে ইয়াহুদী এবং খৃষ্ট ধর্মে অন্যদের প্রতি পরমত সহিষ্ণুতার এরূপ নিদর্শন মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। ই. ডেনিয়ার লিখেছেন যে, মুসলিমদের ব্যাপারে অনেকে যা বিশ্বাস করে আসলে তারা তার বিপরীত।

মুসলিম শাসকরা অমুসলিমদেরকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন কানুন মেনে চলার অধিকার প্রদান করে এসেছেন। মুসলিমদের ন্যায় তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে হয় না। এছাড়া মুসলিমদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে অমুসলিমদের জিহাদ করতে বাধ্য করা হয় না, যদিও যুদ্ধ জয়ের ফলে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সুফল ভোগ করে থাকে।

উপরিউক্ত দুটি বিষয় যথা, যাকাত প্রদান ও জিহাদে অংশ গ্রহণের পরিবর্তে অমুসলিমদের সহনশীলতা ও সাধ্যের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়, যা জিজিয়া নামে পরিচিত। এর পরিবর্তে তারা পেত সকল ধরণের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা।

ইসলাম অমুসলিমদের তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও মতাদর্শ অনুযায়ী বিয়ে, তালাক কিংবা এ ধরণের অন্যান্য কার্যাবলী পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। ইসলাম ধর্মে পাপ কিন্তু তাদের ধর্মে পাপ নয় এমন কাজের জন্য তাদের লোকদের ইসলামি আইন অনুযায়ী বিচার করা নিষিদ্ধ। যেমন, মদ খাওয়া, শূকরের মাংস খাওয়া ইত্যাদি।

ইসলাম হচ্ছে ন্যায়ের ধর্ম, সাম্যের ধর্ম। আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রতিটি বিষয়ে ন্যায়ের মানদণ্ড বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ অ সুবহানাহু তাআলার নির্দেশ হচ্ছে সর্ব বিষয়ে সাম্য বজায় রেখে চলা, এমনকী বিচারের সময় যদি ফয়সালা নিজেদের বিপক্ষে যায় তবুও। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেন যে, তোমরা গচ্ছিত মাল পৌঁছে দাও তার মালিকদের কাছে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে, আল্লাহ্ যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন' (সূরা আন্ নিসা ৪:৫৮)। এই ন্যায় বিচারের অধিকারী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে গোটা মানবজাতি।

তাই তো দেখি, অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম শাসকরা ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে বহু ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে আজও বিরাজমান। এই ধরণেরই একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, যা অতি বিস্ময়ে ভরা।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা বা রাষ্ট্রপতি আলি ইবনে আবু তালিবের সঙ্গে এক সাধারণ ইহুদীর বিরোধ বাধে একটি বর্মকে কেন্দ্র করে। একদিন আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার হারানো একটি বর্ম কুফার এক নগরে জনৈক ইহুদীকে বিক্রি করতে দেখেন এবং বর্মটি তাঁর নিজের বলে দাবী করেন। কিন্তু ইহুদীটি আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র দাবী প্রত্যাখ্যান করে। শেষ পর্যন্ত এর ফয়সালার দায়িত্ব বিচারক সুরায়িহ ইবনে আল্ হারিস আল্ ফিন্দি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ওপর বর্তায়। বর্মটি যে তাঁর এটা প্রমাণ করার জন্য আলি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসেনের নাম সাক্ষী হিসাবে প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইসলামের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ বিচারক বলেন : 'হে বিশ্বাসীদের নেতা। পিতার ব্যাপারে পুত্রের সাক্ষী বিচারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।' যার ফলে মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রপতি বিচারে শেষ পর্যন্ত হেরে যান এবং বর্মটি ইহুদির বলে রায় দেওয়া হয়। এই নিরপেক্ষ বিচার দেখে ইহুদিটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পড়ে মুসলিম হয়ে যান। তারপর সে বলে উঠল, 'হে আলি! এ বর্মটি আপনরাই, আপনি রাতে এটা ফেলে গিয়েছিলেন এবং আমি তা কুড়িয়ে নিই।' যাইহোক, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নবর্ণিত নির্দেশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্থির থাকবে আল্লাহ্র জন্য ন্যায় সাক্ষ্য দান সম্পর্কে; এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কখনও অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। ন্যায় বিচার করবে। ন্যায় বিচার করাই পরহেজগারিতার অতি নিকটবর্তী। আল্লাহ্কে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্পূর্ণ খবর রাখেন তোমরা যা কর' (সূরা আল্ মায়িদাহ্ ৫:৮)।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করাটাও ইসলামে অপরিহার্য। এ অধিকারসমূহ

হল জীবন, সম্পদ এবং সম্মানের নিরাপত্তা। বিদায় হজ্জে আরাফার ময়দানে বিশ্বনাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঘোষণা করেছিলেন : 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান পবিত্র; যেমন পবিত্র তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ শহর এবং এ মাস' (বুখারী ৬৭, মুসলিম ১৬৭৯)।

এ পবিত্রতা শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, কারণ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরও বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি চুক্তিবন্ধ (অমুসলিম) সম্প্রদায়ের কাউকে হত্যা করে তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, যদিও জান্নাতের এ সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের সফরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়' (বুখারী ৩১৬৬)।

কোনো ভাবেই কোনো অমুসলিমকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না, যেমন, তার সম্মানের হানি করা, অন্যায়ভাবে তার সহায়-সম্পদ দখল করা কিংবা কটুক্তি করা। একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুসলিমদের মধ্যে কোনো একজন লোক চুক্তিবন্ধ সম্প্রদায়ের কোনো একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। এ খবরটি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছে যায়। তখন তিনি বলেন, 'আমি ঐ ব্যক্তি যে চুক্তিবন্ধ সম্প্রদায়ের সাথে ওয়াদা পালন করতে বাধ্য।' ফলে হত্যাকারীকে হত্যার সাজা হিসাবে ফাঁসি দেওয়া হয়। ওই একইভাবে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত মুসলিমদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলান।

মুসলিমদের জন্য জিহাদ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ফরজ বা আবশ্যিক। কিন্তু এখানেও একটি সীমারেখা আছে। আর তা হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া জিহাদ করা যাবে না। আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে যদি কেউ আক্রমণ করে, যদি কেউ চুক্তি ভঙ্গ করে কিংবা যুদ্ধ-বিরতি লংঘন করে, ধর্ম প্রচারের জন্য যদি দাঈদের বাধা দেওয়া হয় তাহলে কিংবা অত্যাচারিত ও নিগৃহীত মানুষদের রক্ষা করার মানসে জিহাদের অনুমতি আছে। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন, 'আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছো না আল্লাহ্র পথে এবং সে সব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, এ এলাকা থেকে আমাদের বার করে নাও, এখানকার বাসিন্দারা বড়ই যালিম। আর তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কাউকে সাহায্যকারী বানিয়ে দাও' (সূরা আন্ নিসা ৪:৭৫)।

অমুসলিমদের সঙ্গে কীরূপ আচার আচরণ করতে হবে সে ব্যাপারেও কুরআন দিক নির্দেশনা দিয়েছে। পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে অবশ্যই উত্তম ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু অ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘড়-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি' (সূরা মুমতাহিনা, ৮)।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জীবনচরিত আলোচনা করলে দেখা যাবে তিনি অমুসলিমদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করতেন। অমুসলিম প্রতিবেশীরা অসুস্থ হলে তিনি তাদের দেখতে যেতেন, তাদেরকে হাদীয়া পাঠাতেন এবং ব্যবসায়িক কাজে তাদেরকে বিশ্বাসও করতেন।

অমুসলিমদের প্রতি ভালো ব্যবহারের ব্যাপারে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকেও শিক্ষা দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা বর্ণনা করা যেতে পারে :

যায়দ ইবনে সামাহ্ নামক এক ইয়াহুদি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কাছে এসে দেনা পরিশোধের দাবি জানায়। সে তাঁর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জামার আস্তিন ধরে টেনে হিঁচড়ে কর্কশ ভাষায় বলতে থাকে : 'ওহে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমার ঋণ পরিশোধ করবে না? তুমি এবং তোমার গোত্র বানু মুত্তালিবের লোকেরা কখনও সময়মতো দেনা পরিশোধ করে না।' এসব দেখেশুনে উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ওই ইহুদিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই আল্লাহ্র দুশমন শুনে রাখ— আমি যদি আশংকা না করতাম যে আমাকে তিরস্কার করা হবে তাহলে এ তলোয়ার দিয়ে তোর মুণ্ড উড়িয়ে দিতাম।' রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উমারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'হে উমার! তোমার কাছ থেকে এরূপ কথা শুনতে চাই না। তোমার উচিৎ আমাকে উপদেশ দেওয়া যাতে করে আমি সময়মতো দেনা পরিশোধ করি এবং তাকে বলি যে, সে যেন সম্মানজনকভাবে ঋণের টাকা ফেরত চায়। এবার যাও, তাকে ঋণের টাকা ছাড়াও আরও অতিরিক্ত বিশটি মুদ্রা প্রদান কর।'

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এই অভাবনীয় ব্যবহার উক্ত ইহুদিকে বেজায় মুগ্ধ করে। যার ফলস্বরূপ সে সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম হয়ে যায়।

অমুসলিমদের প্রতি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মহানুভব ব্যবহারের অনুসরণ করেছেন তাঁর সাহাবাগণও।

উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আদেশ জারি করেন যে, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জীবিত থাকা অবস্থায় যে যে ইহুদী পরিবারকে দান করতেন, তাদেরকে সরকারি তহবিল থেকে সরকারি ভাতা প্রদান করা যেন অব্যাহত থাকে।

ইসলামি আইন নাগরিকদের খাদ্য-নিরাপত্তা প্রদান করে সেজন্য ইসলামি রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত নাগরিক বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে সক্ষম তাদের কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া এবং যারা কাজ করতে সক্ষম নয় তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে খলীফাগণ এবং বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরগণ অমুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করে কত অসংখ্য ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন : একদা খলীফা একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে বয়স্ক এক অন্ধ ভিক্ষুক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কীসে তোমার এ অবস্থা করেছে?' সে বলল, 'জিজিয়া, দারিদ্র এবং বৃদ্ধ বয়সই আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী'। এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে তাঁর নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর নিজস্ব তহবিল থেকে তাকে কিছু দান করলেন। অতঃপর প্রধান কোষাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিলেন যেন তাকে ও তার মতো অন্যান্যদের সরকারি তহবিল থেকে সাহায্য করা অব্যাহত থাকে। সেই সঙ্গে খলীফা আরও নির্দেশ জারি করেন যেন সেই বৃদ্ধ ইহুদী যারা ইসলাম ও মুসলিমের চরম দুশমন বা তার মতো অন্যান্যদের কাছ থেকে তার জিজিয়া কর আদায় করা না হয়।

এইভাবে বর্ণনা করলে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাবে। যতদিন পৃথিবীতে ইসলামি শাসন ছিল ততদিন অমুসলিমদের জীবন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু ইসলামী শাসন বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমুসলিমরা তাদের নিজ নিজ জাতির হাতেই বঞ্চিত, উৎপীড়িত ও নিপীড়িত হয়ে আসছে। আজকের পৃথিবীতে তাদের না জীবনের মূল্য আছে না সম্পদের।

তবে মুসলিমদের বেশি সজাগ ও সতর্ক হতে হবে যাতে তাদের দ্বারা কোনো অমুসলিম অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এজন্য তাদেরকে শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা জরুরি। না হলে ইহকালে ও পরকালে তারা নিজেদের শান্তি বিঘ্নিত করবে এবং সেই সঙ্গে অন্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ঈমান-আমল-আল্লাহ্ ভীতি ও তাওয়াক্কুল আল্লাহ্

মুহাঃ আব্দুল ওয়াজেদ

ঈমানদারের পরিচিতি ও গুণাবলী সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন —

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অর্থ : যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম বা আয়াত সমূহ তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পালনকর্তার প্রতি ভরসা পোষণ করে। ঐ সমস্ত লোক যারা স্বলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী (সূরা আনফাল, আয়াত নং ২)।

উল্লিখিত আয়াতে কারিমায় মুমিনের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা মুমিনুন-এ মুমিনের সাতটি গুণ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন। যেমন (১) যারা নিজেদের স্বলাতে বিনয়-নম্র, (২) যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত, (৩) যারা যাকাত প্রদান করে থাকে, (৪) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, (৫) যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে এবং (৬) যারা স্বলাত সমূহের খবর রাখে। এরাই জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদে উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি যখন অহী নাযেল হতো তখন এমন একটি মিষ্টি মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় আওয়ায ধ্বনিত হতো। যা তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা উড়ন্ত মৌমাছির শব্দের ন্যায় গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পেত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়ায শুনে আমরা

অহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। অহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং পবিত্র হাত দুখানা তুলে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে লাগলেন —

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ اكرِمْنَا وَ لَا تُهِنَّا وَ اَعْطِنَا وَ لَا تَحرمْنَا وَ اٰثِرنَا و لا تؤخر عَلَيْنَا وَ اَرْضَنَا وَ اَرْضِى عنا.

অর্থ : হে আল্লাহ্ আমাদেরকে বেশি দাও, কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর, লাঞ্ছিত কোর না। আমাদের দান কর, বঞ্চিত করো না। আমাদের অন্যের উপর অগ্রাধিকার দাও, অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিও না। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে তবে সে জান্নাতে যাবে। এরপর তিনি নিম্নের দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। সূরাহ্ মুমিনুনের প্রথম থেকেই আয়াতগুলি হল —

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ٥اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ٥ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াযিদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে প্রশ্ন করেছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর চরিত্র কীরূপ ছিল? তিনি উত্তরে জানালেন, 'কানা খুলুকুহুল কুরআন' অর্থাৎ তাঁর চরিত্র বা স্বভাবগত অভ্যাস কুরআনের প্রতিরূপ ছিল। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন (ইয়ো হাফেযুন পর্যন্ত) এবং বলেন, 'অহী আখলাক রসূলকে থে'। এগুলিই ছিল রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর চরিত্র ও অভ্যাস (ইবনে কাসির সূরাহ্ মুমিনুন, মা'আরেফুল কুরআন)।

সূরা আনফালের আয়াতে মুমিনের পরিচয়ে বলা হয়েছে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র যিকির-স্মরণ ও প্রশংসা এসে যায় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর এবং কম্পিত হয়ে পড়ে বদনমণ্ডল। শিহরণ ও কম্পন শিরোনামে একটি হাদীস সন্নিবেশিত করা হচ্ছে —

মুমিনের হৃদয়ে শিহরণ ও কম্পন

নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তি আপন চাচাতো বোনের প্রতি আসক্ত ছিল। তার ইচ্ছা ছিল অনৈতিক ও নিকৃষ্ট। চাচাতো বোনকে কাছে পাওয়ার ছিল অদম্য বাসনা ও আকাঙ্খা। চাচার জীবিত অবস্থায় তার বাসনা কামনা পূর্ণ হয়নি। চাচার মৃত্যুর পর তার সংসারে নেমে আসে দারিদ্রতা ও ক্ষুৎপিপাসা। কুমারী বোন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বিলাসী ভায়ের শরণাপন্ন হয়ে কাতর কণ্ঠে নিজ পারিবারিক দুঃখ যাতনার বর্ণনা দিয়ে কিছু অর্থ সাহায্যের আবেদন ও প্রার্থনা জানায়।

সুযোগ বুঝে চাচাতো ভাই বলে, আমি দীর্ঘ দিন তোমাকে পাবার আশায় প্রহর গুনছি ও সময়ের অপেক্ষায় রয়েছি। তোমার প্রয়োজন মত তুমি টাকা পয়সা নিয়ে যাও তবে শর্ত এই যে, একান্ত নিরিবিলিতে আমার নির্জন ঘরে এসে সঙ্গ দান করতে হবে। অগত্যায় ও নিরুপায়ে কুমারী তার যাবতীয় শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হল। শর্তমত রাত্রিবেলা চাচাতো ভায়ের নিকট হাজির হয়েও গেল। এমন এক মুহূর্ত উপস্থিত হল, যখন চাচাতো ভাই তার সতীত্ব, পবিত্রতা ও সততার মোহর ভেঙে আপন জঘন্য বাসনা কামনা চরিতার্থ করতে উদ্যত। কুমারী বোন তখন অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কাতর কণ্ঠে আকুলি বিকুলি স্বরে চাচাতো ভায়ের কবজার মধ্যে বলে উঠলো اِتَّقِ اللّٰهَ (ইত্তাকিল্লাহ্) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর ভাই। এমন যেন না হয় যে, ক্ষমতাবান আল্লাহ্‌র কোনো দৃষ্টি ও তাঁর গযব তোমার প্রতি

আপতিত হয়। হে ভাই! শুনে নাও, আজ পর্যন্ত আমার হায়া শরমের, পাক পবিত্রতার বাঁধ ও পাক দামানীর মোহর কেউ ভাঙতে ও বরবাদ করেত পারেনি। ভাইজান! তুমি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার পবিত্র ইজ্জত-আবরু ও কুমারিত্ব নষ্ট করো না। যুবতী রমনী কাঁদো কাঁদো স্বরে ডুকরে ডুকরে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য করজোড়ে চাচাতো ভায়ের কাছে আল্লাহ্‌র দোহাই দিতে দিতে পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

এতসব কাণ্ড কারখানা, ক্রন্দন, আকুলি বিকুলি ও আল্লাহ্‌র দোহায় যুবকের হৃদয় গলে গেল এবং আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে বিদ্ধ হল এমনভাবে যে সেও কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকল। আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তওবা ইস্তেগফার করতে লাগল। কুমারী যুবতীকে দু বাহুর কবজায় পেয়েও আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে পাপ কাজকে প্রত্যাখ্যান করে যুবতীকে রেহায় দিল এবং কুমারী যুবতীর কুমারিত্ব ও শীলমোহর অটুট ও অক্ষত রইল। নব যুবতী রক্ষিত ইজ্জত-আবরু নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেল (বুখারী)।

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত 'কিফ্‌ল'-এর তওবা ও জান্নাত

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বানী ইসরাঈল গোত্রের কিফ্‌ল নামী এক বদকার যেনাকারের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিফ্‌ল একদা ৬০ দীনারের বিনিময়ে এক নব যুবতীকে বদকামের জন্য প্রলুব্ধ করে। যখন কিফ্‌ল ঐ রমণীকে যেনা ও কুকর্মের জন্য উত্যক্ত ও উত্তেজিত করল এবং একান্ত নির্জনে নিয়ে গেল, যুবতী আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। দেহ ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এবং তার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। রমণীর চাঁদবরণ চেহারা বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

এহেন অবস্থা অবলোকন করে কিফ্‌ল যুবতীকে প্রশ্ন করল, তোমার এত ভয়ের কারণ কী? কেন কাঁপছো? সোনার বরণ চেহারা কেন মলিন হয়ে পড়ল? প্রত্যুত্তরে সতী সাধবী পাক পবিত্রা নারী বলল : হে কিফ্‌ল! আজ অবধি কোনও নর আমার সতিত্ব নাস করতে ও আমাকে কলঙ্কিত করতে সমর্থ হয়নি। ক্ষুধার জ্বালায় বেসবুর হয়ে আমি তোমার নিকট অর্থ নিতে বাধ্য হয়েছি। হে কিফ্‌ল! আল্লাহ্‌র কসম আমি কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার সাহস করতে পারিনি। আমি জানি এই দেহ দান অর্থাৎ কুকর্ম নিতান্ত হারাম কাজ। আমি আল্লাহ্‌র আযাবে ভীষণ কম্পিত। হে কিফ্‌ল! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি ও এই পাপকর্ম হতে বিরত হও। আমার সতীত্বের প্রতি ও তোমার জানের প্রতি রহম কর।

এই সরলা, অবলা, নির্মলা, ভদ্রতা ও মার্জিতা কুমারীর পূর্ণ আকর্ষণীয় বাক্যে প্রভাবিত হয়ে কিফ্‌ল বলতে লাগল : হে পবিত্রতা, পূণ্যশীলতা রমণী! তুমি মাত্র একটি পাপের ভয়ে কম্পিত ও শিহরিত হয়ে উঠেছো অথচ লাখ লাখ আফসোস! আমার এই জীবনের। যে জীবনকে আমি হারামকারীতে খতম করে ফেলেছি। হায়! আমার কী দশা হবে? আমি কত নারীর ইজ্জত আবরু লুটেছি। পাপের ও আযাবের মোটেই পরওয়া করিনি। হে রমণী তুমি আমার (পাপের) চোখ খুলে দিলে। বহু পূর্বেই আমার সতর্ক ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন ছিল। হায় আল্লাহ্, আমি কত অধম, কত অত্যাচারী যালেম ও পাপী? তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি অতি নিবিষ্ট চিত্তে তোমার দরবারে তওবাহ্ করছি।

ঐ মুহূর্তে সেই পাকবাজ রমণীর সামনে কিফ্‌ল প্রাণ ভরে ডুকরে ডুকরে কেঁদে আল্লাহ্‌র কাছে লাখো পাপের ক্ষমা চেয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবাহ্ ইস্তেগফার করল এবং বলল, হে কুমারী! আমি তোমাকে যে ৬০টি দীনার দিয়েছি তা আর ফিরিয়ে নিব না, এটা তোমার জন্য হাদিয়া। আল্লাহ্ যে কাজে নারাজ তা কখনও আর করব না।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যেদিন কিফ্‌ল অন্তর খুলে জীবনের পাপের ক্ষমা চেয়ে ইস্তেগফার করল ঐদিন রাত্রেই কিফ্‌ল ইন্তেকাল করল। সকালে জনগণ দেখল যে, কিফ্‌লের ঘরের দরওয়াজায় লিখা আছে — اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ الْكِفْلَ (ইন্নাল্লাহ কাদ গাফারাল কিফলা) সুনিশ্চিত, আল্লাহ্ কিফ্‌লকে বখশিষ ও ক্ষমা করে দিয়েছেন (তিরমিযী)।

এ ঘটনা প্রমাণ করল যে, কিফ্‌ল আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে পাপ কাজের জন্য ইস্তেগফার করায় মহান আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করতঃ তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কাল পর্যন্ত যে পাপকে পাপ বলে মনে করত না, সে রমণীর কাছে আল্লাহ্‌র ভয় ও কম্পন দেখে আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করে আল্লাহ্‌র খাঁটি দাসে পরিণত হয়ে ইহজগত ত্যাগ করল।

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা

شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ.

নিজের কার্যাদি ও বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ কর। পরামর্শ পরে যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ্‌র প্রতি ই'তেমাদ ও ভরসা কর। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসাকারীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন (সূরা আল্ ইমরান)।

সূরা তালাকে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন —

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল হয়, আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট। ইনসান তার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের নাতিজা এবং ফলাফল আল্লাহ্‌র প্রতি অর্পণ করবে এবং কামেল ভরসা ও বিশ্বাস রেখে নিজ কর্ম শুরু করবে এটাই হচ্ছে তাওয়াক্কল।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন ভরসা করবে যাকে ভরসা বলা যায়। তাহলে তিনি তোমাদের এমনভাবে রুযী পৌঁছাবেন যেমন ভাবে পরিন্দা ও পাখীদের পৌঁছায়ে থাকেন। পাখীকুল সকালে খালি ও ভুখা পেটে বেরিয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ও আসুদা হয়ে বাসায় ফিরে।

উক্ত হাদীসে নিষ্কর্মা, তদবীর বিমুখ বসে থাকার কথা বলা হয়নি। কারণ পাখীরা বাসায় বসে থাকলে রুযী পৌঁছেনা বরং উড়ে ক্ষেত খামারে বাগ বাগিচায় আহারের তালাশে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অনুরূপভাবে মানুষকে মেহনত মোশাক্কাত, পরিশ্রম জাদ্দো জেহাদ, খোঁজখবর ও অনুসন্ধানের পর আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

একদা এক বেদুঈন উটে সওয়ার হয়ে নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে সওয়াল করল : হে আল্লাহ্‌র নাবী! আমি আমার উটটিকে এমনিই বিনা বাঁধনে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা স্থাপন করলে আমি উটটিকে পাব কিনা? নবীজী ইরশাদ করলেন : প্রথমে মযবুত দড়ি দিয়ে তোমার উটটিকে বেঁধে রাখ তারপর আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর (তিরমিযী)।

হিযরতের সময়ে স্বয়ং নবীজী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গারে সওরে আত্মগোপন করেছিলেন। কুফফারে মুশরেক তাঁর পায়ের দাগের নিশান ধরতে ধরতে একেবারে গারে সওরের মুখে এসে হাযির হয়। এহেন অবস্থায় কার না হুঁশ বিগড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলে উঠেন, এখন আমাদের কী হবে? দুশমন তো এক্কেবারে গারের মুখে এসে পড়েছে, তাদের পাগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমাদের প্রাণে বাঁচার আর কোনও উপায় দেখছি না।

আল্লাহ্‌র নাবী পূর্ণ তাওয়াক্কুল, পুরসোকুন আত্মবিশ্বাস ও আত্মিক শক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন — لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا অর্থাৎ চিন্তিত ও বিষন্ন হয়ো না। নিরাশ ও শোক বিহ্বল হয়ো না, করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। ভেবে দেখতে হবে, নাবী ছাড়া এমন নির্ভরশীলতার খাজানাখানা আর কোথায় হবে? তিনি এতটুকুও বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন না। হিজরতের পথে একশত লাল উট পুরস্কারের লোভে সোরাকা ঘোড়া ছুটিয়ে অতি নিকটবর্তী হলে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ভীষণ ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। অথচ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একটি বারের জন্য সোরাকার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। একমাত্র মহামহিম আল্লাহ্‌র প্রতি অটল নির্ভরশীলতায় অটুট থাকলেন।

মহাত্মা আবু বাকর ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হিজরতের ব্যাপারে যে অসাধারণ ধৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা ও আল্লাহ্ নির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। নবীজী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিছানায় খোলা তরবারীর নীচে আলী কেমন অবিচল চিত্তে সমস্ত রাত্রি শুয়ে কাটালেন। وَ مَنْ يُّطِيعِ اللهَ و رسوله فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا অর্থাৎ যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে মহান সফলতা অর্জন করে। নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আক্রমণ করলে সর্বপ্রথম তরবারীর আঘাতে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রাণ হারাতেন। সেই ভয়টুকু ও তাঁর হৃদয়ে ছিল না। নাবীর প্রতি কী অগাধ ভালবাসা-মুহাব্বাত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বাঁচাতে নবীজীর চাদর গায়ে দিয়ে বিনা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে শুয়ে রইলেন নবীজীর বিছানায় তাঁর নির্দেশ মত মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে। নবীজীর কাছে মুশরিকদের আমানতের গচ্ছিত দিরহাম-দীনার সোনা চাঁদি ও অলঙ্কার যথা নিয়ম মালিকের হাতে তুলে দিতে রেখে গেলেন নাবীজী নিজ

হৃদয়ের টুকরো আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে। আলী ভেবেছিলেন ''নাবী আমাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে পার হয়ে যাবেন তা কখনও হতে পারে না। অভ্রান্ত সত্য যে নাবী মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সমস্ত কিছু জেনে শুনেই এরূপ মহাবিপদের মুখে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে আমাকে তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে নির্দেশ দিলেন। আমিও সেই প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মাকে সোঁপে দিয়ে শুয়ে ছিলাম। মহান করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর নাবীকে ও তৎসঙ্গে আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।''

পাঠকবৃন্দ স্মরণ করুন ভক্তরাজ আবু বাকরের আল্লাহ্‌র ভরসার কথা। আপন কন্যা আসমা ও আয়েশাকে কেমন করে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করে মহান আল্লাহ্‌র যিম্মায় রেখে পাড়ি দিচ্ছেন মদীনার হিজরতে। তখন আসমা ও আয়েশা খুব বয়সের না হলেও এই মহাবিপদে দুর্বৃত্ত কুরায়েশদের মাঝে ছেড়ে যাওয়া যে চরম অস্বস্তিকর অবস্থা ছিল তা বিস্ময়কর। অত্যাচারী যালেম আবু জাহল আসমাকে এত জোরে তামাচা মেরেছিল যে মারের ধমকে আসমার কানের বালি ছিঁড়ে পড়েছিল। এই মহাবিপদে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোনো সহায় সম্বল ছিল না।

পাঠকবৃন্দ স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ ইব্রাহিম (আলাইহিস্ সালাম) কে নির্দেশ দেন বিবি হাজেরা ও দুগ্ধ পোষ্য ইসমাঈলকে জনমানব ও পশুপক্ষীহীন মরু প্রান্তরে শুনশান-বিয়াবানে ছেড়ে দিতে। শ্রেফ কিছু খেজুর ও এক মশক পানি সহ ছেড়ে আসেন আবাদহীন কাবাঘরের পাশে। যখন ইব্রাহিম (আলাইহিস্ সালাম) তাদের ছেড়ে আসবার উপক্রম করেন, তখন হাজেরা বলেন, اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا অর্থাৎ কার হাওয়ালা করে যাচ্ছেন? দু বার কোনো জবাব দিলেন না। তৃতীয়বারে ইব্রাহিম (আলাইহিস্ সালাম) বলেন, اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভরসায়। আল্লাহ্‌কে সঁপে যাচ্ছি। একথা শুনে হাজেরা বলেন, اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাওয়ালা আমাদের মঞ্জুর আছে, তিনি আমাদের বরবাদ করবেন না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ভরসাকারীনিকে ধ্বংস করলেন না।

হাজেরার তাওয়াক্কুল আল্লাহ্ মহান স্রষ্টাকে এত পছন্দ হল ও এত ভাল লাগল যে, কিয়ামত পর্যন্ত এক মহা নিদর্শন কায়েম করে দিলেন। মহামতি হাজেরার স্বামী প্রদত্ত এক মশক পানি ও খেজুর শেষ হয়ে গেলে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। দুধের বাচ্চা ইসমাঈল এর মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে কাবাব হয়ে গেল। এমতাবস্থায় হাজেরা পানির তালাশে দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন। আস্তানার নিকটবর্তী পাহাড় সাফা-মারওয়ায় চড়ে দূরদুরান্তে পানির তালাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যদি কোনো মুসাফির-পথিক দেখতে পাওয়া যায়। তার নিকট থেকে ভিক্ষা স্বরূপ এক কাতরা, এক ফোঁটা পানি চেয়ে মুমূর্ষ বাচ্চার ঠোঁট দুটি তরুতাজা করবে। একবার নয়, দুবার নয় সাত সাতবার সাফা মারওয়ায় আরোহন করে দূর থেকে দূরে নেগাহ ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোন মানবের সন্ধান কিংবা এক কাতরা পানির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন না।

হাজেরার এই ছুটাছুটি মহান আল্লাহ্‌কে এত ভাল লেগেছিল যার দরুন তিনি চিরকালের জন্য বহাল রেখে দিলেন সাফা মারওয়ার সায়ীকে। করুণাময় আল্লাহ্ হাজেরার আল্লাহ্ ভরসার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হয়ে ইসমাঈলের পায়ের গোড়ালীর নীচে একটি পানির ঝরণা বা উৎস সৃষ্টি করে দিলেন। যখন এই পানির উৎস হাজেরার চোখে পড়ল ছুটে এলেন সেখানে। পানির ফোয়ারা দেখে যেন হাজেরা হতচকিত। ছোট ছোট পাথর দিয়ে বাঁধ বাঁধিয়ে পানি রোখার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং পানিকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন زَمْ - زَمْ যাম-যাম অর্থাৎ হে পানি থাম, থাম। তিনি বাঁধ দিয়ে বহ্‌তি পানিকে থামাতে সক্ষম হলেন। زَمْ - زَمْ শব্দটি আল্লাহ্ কবুল করে নিলেন বলে ঐ প্রস্রবণটির নাম زمزم যমযম রয়েই গেছে। এত পবিত্র ও মিষ্টি পানি পৃথিবীর বুকে আর কোথাও নেই।

সারমর্ম এই যে, হাজেরা এই চাটিয়াল ময়দান ও মরুপ্রান্তরে আল্লাহ্‌র হাওয়ালা কবুল করে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা স্থাপন করে যে নজির সৃষ্টি করলেন, করুণাময় আল্লাহ্‌ও এই নজির ও দৃষ্টান্তকে মহামানবের জন্য চিরজীবী করে রাখলেন। সারা বিশ্বের হজ্জব্রত পালনকারীগণ সাফা মারওয়ার সায়ী করে থাকেন এবং হাজেরার সুন্নাতকে পালন করে থাকেন।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ্! তোমার প্রতি পূর্ণ আস্থা, ভরসা ও তাআক্কুল আমাদের অন্তরে দান করো — আমীন।

শির্ক করো না বিদ্‌আত করো না আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করো না

এম.এ. হান্নান

বিদ্‌আত

যেসব কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদাত বা সাওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যা করেননি কিংবা যা করতে বলেননি সেসব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সাওয়াবের কাজ বিবেচনায় পালন করার নামই বিদ্‌আত।

বিদ্‌আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্বেও দ্বীনের মধ্যে কোনো নতুন প্রথা উদ্ভাবন করা। বস্তুতঃ দ্বীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে কোনো বিষয়ে বৃদ্ধি করা কিংবা কোনো নতুন বিষয়কে দ্বীন মনে করে তদানুযায়ী আমল করলে সাওয়াব হবে বলে মনে করাই হচ্ছে বিদ্‌আত।

মাওলানা মহিউদ্দিন খান সংকলিত আরবী-বাংলা অভিধান আল কাউসার' (পৃষ্ঠা ৮৬) অনুযায়ী বিদ্‌উন' শব্দের অর্থ হলো নবোদ্ভাবিত বস্তু এবং বিদ্‌আতুন' শব্দের অর্থ দ্বীন ইসলামে সাওয়াবের আশায় নব আবিস্কৃত বিষয় বলে উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে অনেক কিছুই আবিষ্কার হয়েছে। যেমন - উড়োজাহাজ, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি যার ব্যবহার মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু সব ধর্মের লোকেরাই করে থাকেন। সবই মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেটার উপকার যেমন সমস্ত মানব জাতি পেয়ে থাকে তেমনি মুসলিমগণও পেয়ে থাকে। এগুলো ব্যবহারে সাওয়াবের কোনো ব্যাপার নেই। এসব উদ্ভাবিত বিষয়গুলো হলো বিদ্‌উন।

দ্বীনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কর্তৃক আনিত দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার পর কোনো নতুন কাজ, অনুষ্ঠান, রসম-রেওয়াজ দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এগুলো করলে সাওয়াব হবে বলে বিশ্বাস করার নামই হল বিদ্‌আতুন। এ বিদ্‌আত চালু করা, বিদ্‌আতী কাজ করা সম্পর্কিত হাদীস শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য; অন্য কোনো ধর্মের মানব গোষ্ঠীর জন্য নয়।

মৌলবীগণ বিদ্‌উন ও বিদ্‌আতুন শব্দের অর্থের তালগোল পাকিয়ে তাদের আশা পূর্ণ করার জন্য বলে থাকেন : বিদ্‌আত দুই প্রকার (ক) বিদ্‌আতে সাইয়া এবং (খ) বিদ্‌আতে হাসানা। অর্থাৎ - খারাপ বিদ্‌আত ও ভাল বিদ্‌আত। যেমন বলা হলো খারাপ মদ ও ভাল মদ অথবা বলা হলো খারাপ চোর ও ভাল চোর। যারা খারাপ খাদ্যবস্তু কিংবা খারাপ মানুষ সম্পর্কে জানে তারা নিশ্চয়ই খারাপকে দু-ভাগে ভাগ করতে যাবে না। তদুপরি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তো নিজেই পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দ্বীনের মধ্যে সব নব উদ্ভাবিত বিষয়ই হচ্ছে বিদ্‌আত, সমস্ত বিদ্‌আতই হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং সমস্ত পথভ্রষ্টতার স্থানই হলো জাহান্নাম। তাহলে দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদ্‌আত কী তা কি মৌলভী সাহেবরা জানেন না? জানলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরেও বিদ্‌আতকে দুভাগে ভাগ করতেন না এবং বিদ্‌আতীদের পরিণাম চিন্তা করে এ সর্বনাশা বিদ্‌আতী কার্যকলাপ চালু রাখতেন না। আসলে তাঁদের অনেকেই পেট পূজা আর শয়তানের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও তা মেনে চলেন না কিংবা অন্যকেও বিদ্‌আত পরিহার করার দাওয়াত দেন না।

মওলানা আব্দুর রহীম সাহেব তাঁর 'সুন্নাত ও বিদ্‌আত' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন : ''এ বিষয়ে আমার শেষ কথা হলো, বিদ্‌আতকে দু-ভাগে ভাগ করাও হলো একটা বিদ্‌আত। এ বিভাগের সুযোগে অসংখ্য মারাত্মক বিদ্‌আত ইসলামের গৃহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দ্বীনী মর্যাদা লাভ করেছে, বড় সাওয়াবের কাজ বলে সমাজের বুকে শিকড় মজবুত করে গেড়ে বসেছে। এ বিষবৃক্ষের যত তাড়াতাড়ি উৎপাটিত করা যায়, ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে ততই কল্যাণকর।"

দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু প্রচলন করা স্পষ্টতঃ দ্বীনের পরিপন্থী।

(ক) আল্লাহ্ বলেন : ''আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার অনুগ্রহ তোমাদের

প্রতি পূর্ণ করেছি আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে নিয়েছি" (সূরাহ্ মায়েদাহ্, আয়াত নং ৩)।

(খ) এমন প্রত্যেক কথা, শরীআতে যার কোনো দলীল নেই এবং এটাকে দ্বীনের ও সাওয়াবের কথা বুঝে আমাল করাকে বিদ্আত বলা হয় (বেহেশ্তী জেওর)।

(ক) আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন জিনিস আনবে যা আসলে দ্বীনের মধ্যে গণ্য নয় তা হল প্রত্যাখ্যানযোগ্য" (বুখারী ও মুসলিম)।

(ঘ) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, "জেনে রাখ, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্ম বিধান হচ্ছে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপস্থাপিত জীবনপন্থা। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম জিনিস হচ্ছে নবোদ্ভাবিত (বিদ্আত) মতাদর্শ, প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শই হলো সুস্পষ্ট গোমরাহী (মুসলিম)।

(ঙ) যে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বাধ্যতা স্বীকার করল, সে আল্লাহ্র বাধ্যতা স্বীকার করল। আর যে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর অবাধ্য হলো, সে আল্লাহ্র অবাধ্য হলো। এক কথায় মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হচ্ছেন মানুষের (মুসলিম ও কাফিরের) মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড (বুখারী)।

(চ) যে ব্যক্তি আমার উম্মাত বিগড়িয়ে যাওয়ার কালে আমার সুন্নাতকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের সাওয়াব রয়েছে (মিশকাত যঈফ)।

(ছ) যে আমার (রসূলের) সুন্নাত (জীবন বিধান) হতে বিমুখ হবে, সে আমার তরীকার নয় (বুখারী ও মুসলিম)।

(জ) যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে (আত্ তিরমিযী)।

বিদ্আতির পরিণাম : (ক) আল্লাহ্র হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আল্লাহ্ এ ধরণের যালিমকে কখনোই হিদায়াত দান করেন না (সূরা আল্ কাসাস, আয়াত নং ৫০)।

(খ) আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য আছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং ১৪)।

(গ) ইয়াযিদ বিন শরীক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের খুৎবা শুনালেন। তিনি বলেন, কিতাবুল্লাহ্ (যা আমরা পড়ি) ছাড়া আমাদের নিকট কোনো কিতাব নেই। তবে এই সহীফা ছাড়া। অতঃপর তিনি বলেন , এর মধ্যে আছে যখমের (কিসাসের) বর্ণনা এবং উটের বয়সের বর্ণনা এবং মদীনা হারাময়ীর পাহাড় থেকে সাওর পাহাড় পর্যন্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এর মধ্যে বিদ্আত আবিষ্কার করবে অথবা বিদ্আতীকে আশ্রয় দেবে তার উপর আল্লাহ্র লানত, ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত। আল্লাহ্ তার ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। যে গোলাম অন্য মালিককে নিজের মালিক বলে দাবী করবে তার উপরেও তদ্নুরূপ। মুসলিমদের যিম্মা একই। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে অপমান করবে তারও উপর অনুরূপ (লানত) (সহীহ্ বুখারী)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, (ক) দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ্আত, প্রত্যেক বিদ্আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম (মুসলিম)।

(খ) ক্বিয়ামত দিবসে হাওযে কাউসারে আমি তোমাদের অগ্রগামী হব। যে আমার নিকট যাবে সে তা পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। সেদিন আমার নিকট অনেক দল হাযির হবে। আমি তাদেরকে চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। অতঃপর তাদের ও আমার মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। আমি তখন বলব :তারা আমার উম্মাত। তখন উত্তর হবে, তুমি জানো না যে, তোমার পরে তারা কী কী বিদ্আত কাজ করেছে। তখন আমি বলব : দূর হও ! দূর হও ! আমার পরে যারা সুন্নাতে পরিবর্তন এনেছো ? (বুখারী, মুসলিম)।

(গ) যে ব্যক্তি কোনো বিদ্আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাকে লানত করেন (মুসলিম)।

(ঘ) বিদ্‌আতীর স্বলাত, সিয়াম, হজ্জ প্রভৃতি ফরয কিংবা নফল কোনো ইবাদতই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না এবং সে ইসলাম থেকে এরূপ ভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে মাখানো আটা থেকে একগুচ্ছ চুল বের হয় (ইবনু মাজাহ্)।

(ঙ) দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন নিয়মই বিদ্‌আত এবং প্রত্যেক বিদ্‌আতীই জাহান্নামী (নাসায়ী)।

(চ) যে লোক কোনো বিদআতী কিংবা বিদ্‌আতপন্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল সে তো ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল (বায়হাকী)।

(ছ) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বিদ্‌আতী লোকের নেক আমল কবুল করেন না যতক্ষণ না সে ঐ বিদ্‌আত কাজ হতে বিরত থাকে (গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন)।

(জ) শায়খ আব্দুল কাদির জ্বিলানী বিদ্‌আতীদের সালাম পর্যন্ত দিতেন না (গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন, যঈফ। তবে অন্য সহীহ্ হাদীস এর ভাবার্থ এই হাদীসকে সমর্থন করে)।

(ঝ) শায়খ ইমাম গাজ্জালী, হাসান বাসরী হতে বর্ণনা করেছেন, শয়তান বলে : আমি উম্মাতে মুহাম্মাদীর সামনে পাপকে সুসজ্জিত করে প্রকাশ করি, কিন্তু তাদের ইস্তিগফার আমার কোমর ভেঙে দেয়। তখন তাদের সামনে এমন পাপের কাজ পেশ করি যাকে তারা পাপের কাজ বলেই মনে করে না। সুতরাং ইস্তিগফার করার কোনো প্রয়োজনই বোধ করে না। আর ঐ সমস্ত পাপের কাজ হলো বিদ্‌আত, যাকে তারা দ্বীন বলে মনে করে। অথচ সেটা দ্বীনের কোনো অংশই নয় (ফাযায়িলে যিকর)।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যখনই কোনো জাতি দ্বীন সম্পর্কে কোনো বিদ্‌আত সৃষ্টি করেছে, তখনই আল্লাহ্ তাদের মধ্য হতে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিয়েছেন (মিশকাত যঈফ)।

প্রচলিত বিদ্‌আত

শবে বরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়া ও বিতরণ করা, ঐ রাতে বিশেষ স্বলাত পড়া, মিলাদ ও কিয়াম করা, কদমবুসি করা, অযূর সময় গর্দান মাসাহ করা, অযূ ও স্বলাতে মুখে নিয়াত পাঠ করা, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নাম শুনে আঙ্গুলে চুম্বন খাওয়া, জালালী খতম করা, কুলখানী করা, চল্লিশে পালন করা, কবরে আগরবাতি দেওয়া, আলো জ্বালানো, ফুল ও চাদর দেওয়া, আযান দেওয়া, হালকায়ে যিকির করা, শবে মিরাজের রাতে বিশেষ ইবাদত ও স্বলাত পড়া, প্রস্রাব করে ৪০ কদম হাঁটা, জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা, খাত্‌নার সময় দাওয়াত খাওয়ানো, মানুষ মারা গেলে কুরআন খতম করে দুআর অনুষ্ঠান করা ও খাওয়ার অনুষ্ঠান করা, বাইয়াত করা, ফরয স্বলাতে একত্রিতভাবে সব সময় দুআ করা, পীরের বাইয়াত করা, ফরয স্বলাতের পর উচ্চকণ্ঠে মিলাদ ও যিকির করা, ওয়ায মাহফিলে জামআতে সুর করে এক সাথে দরূদ পাঠ করা, খতমে তারাবীহ্, ফাতিহা ইয়াযহম পালন, জসনে জুলুস, ওরশ অনুষ্ঠান, মাযারে কুরআন পাঠ, নেকীর উদ্দেশ্যে মাযার যিয়ারত করা, মাযার-কবর পাকা করা, মৃত লাশের কাছে কুরআন পড়া বা মৃত ব্যক্তির নামে চেহলাম, অযূ করার সময় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার দুআ পাঠ, মহর্‌রমে তাজিয়া করা, মারসিয়া পাঠ, সফর, চাঁদের চারি সম্বায়ে গোসল, মাযহাব মানা, রবিউল আউয়াল চাঁদে ফাতিহা দোয়াজ দোহাম, কবর পূজা, পীর ধরা, পবিত্র বিয়ের সময় অনৈসলামিক অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি বিদ্‌আত। এসব বিদ্‌আত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে অন্য প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব - ইনশাআল্লাহ্।

১ম পর্ব

ব্রেলভী তালীমাত (ব্রেলভীদের শিক্ষা)

শহীদ আল্লামা এহসান ইলাহী যাহীর লাহোরী (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ইসমাঈল শাম্‌শীর (রাহেমাহুল্লাহ্)

যেরূপ ব্রেলভী হুযূরদের নির্দিষ্ট কিছু আকীদা (মৌলনীতি) আছে, তদনুরূপ তাদের কিছু শিক্ষাও আছে। যা পানাহার ও আয় উপার্জনের মধ্যে চাকার মত ঘুরাফিরা করে।

ব্রেলভী মতবাদের অধিকাংশ মসলা শুধুমাত্র এজন্য তৈরী করা হয়েছে যে, এর দ্বারা সরল প্রাণ সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে পানাহারের ধারাবাহিকতা বরাবর চালু থাকে।

ব্রেলভী মোল্লাগণ নিত্য নতুন মসলা বা ধর্মীয় রীতি-নীতি তৈরি করে, নতুন নতুন বিদ্‌আত আমদানী করে, ধর্মের মধ্যে এমন লাভদায়ক ব্যবসা করে, যাতে মূলধন বা পূঁজির প্রয়োজন হয় না।

ব্রেলভী হুযূরেরা মাযার তৈরির আদেশ দিয়ে নিজেরাই দারোয়ান, তত্বাবধায়ক ও খাদেম হয়ে আস্তানা গেড়ে বসে। নযর ও নিয়ায (মানত ও সিন্নী) এর নামে মুর্খ জনগণের সম্পদ লুটে নিজেরা আত্মসাত করে সম্পদশালী পুঁজিপতিদের দলভুক্ত হচ্ছে। গরীবের রক্ত শোষণ করে বুযুর্গের দোহায় দিয়ে মানত ও সিন্নী দ্বারা প্রতিপালিত লোকেরা ধর্মের নামে দুনিয়ার পূজারী হয়েছে। তাওহীদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সমাজ কোনোদিনই ইসলামী সমাজ হতে পারে না। পাকিস্তানে যতদিন শির্ক ও বিদ্‌আতের কেন্দ্রসমূহ পরিচালনাকারী নির্লজ্জ অর্থলোভী মুজাবির বর্তমান থাকবে, ততদিন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ণের স্বপ্ন সফল হবে না (আমাদের ভারতেও গদ্দীনশীন পীর মুজাবিরগণ যতদিন থাকবে ততদিন শির্কমুক্ত তাওহীদপন্থী মুসলিম সমাজ গঠন করা যাবে না)।

মুরিদের পকেটের দিকে দৃষ্টিপাতকারী, দুনিয়া লোভী পীর ও মাশায়েখগণ যতদিন মানুষকে মানুষের দাসত্বের শিক্ষা দিবে, ততদিন আমাদের এ সমাজ তাওহীদের ঐশ্চর্য্য ও মহিমা অনুভব করতে পারবে না। আর যতদিন সমাজে তাওহীদের চাহিদা পূর্ণ হবে না ততদিন নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার মুকাবিলা (প্রতিদ্বন্দিতা ও প্রতিযোগিতা) করার ধারণা অসম্ভব ও পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়।

নাস্তিকতা ও ধর্মবিমুখতার প্লাবন রুখতে হলে, মানুষের গোলামীর শিকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাওহীদের শিক্ষা দিতে হবে।

আল্লাহু আল্লাহু সুর টেনে মাথা হিলানো, কাওয়ালীর নামে ঢোলের বাজনার সাথে সাথে নাচ করা, অশোভনীয় অঙ্গ-ভঙ্গী করে, হস্ত প্রসার করে চাইতে চাইতে সবুজ চাদরের প্রান্ত ধরে ভিক্ষার হস্ত প্রসার করে মাজারে চাপাবার জন্য নিয়ে যাওয়া এবং হাস্যকর ঘটনাবলীকে কেরামতী নাম দেওয়া - খাবার ও পান করার জন্য নিত্য নতুন কু-প্রথা চালু করা ছাড়া আর কিছু নয়। নবীন প্রজন্ম মাযহাব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, এই কু-প্রথা হতে মুক্ত হবার আশায় নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মহীনতার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে।

ব্রাম্মন, মোল্লা ও পীরগণ ধর্মের নামে দুনিয়ার অর্থ-উপার্জনের জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা ও তাঁর নির্দেশাবলী ধ্বংশ করে দিচ্ছে।

কবর পূজার অভিশাপ, বার্ষিক উরস, মেলা, ফাতিহা ইয়ায দহম, কুল ও চালিসা ইত্যাদির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। এসব দুনিয়াতে অর্থ সংগ্রহের চালাকী ও ফন্দি। কিন্তু কে বোঝাবে এসব মাশায়েখ তরিকতপন্থী পীরগণকে? এরা চোখে পর্দা দিয়ে দুনিয়াতে নিজেকে অপমান করছে এবং পরকাল নষ্ট করছে।

যাঁরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছেন ও চাল-চলন সম্পর্কে নিষেধ করছেন, তাঁদের ওহাবী ও আওলিয়া কেরামের অপমানকারী বলে দুর্নাম করা হচ্ছে। তাঁদের পুস্তকাদি পাঠ ও তাঁদের সাথে মেলামেশা করা পাপের কাজ ও অপরাধ বলা হচ্ছে। দেখুন ফত্‌ওয়া রিয্‌বিয়া ৬/৫৪ পৃষ্ঠা ও ৫/৮৯ পৃষ্ঠা। এই ভয়ে যে, জনগণ তাঁদের ওয়ায, নসীহত ও সদুপদেশে সৎপথে ফিরে গেলে পীরদের দুনিয়ার অর্থোপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে।

আসুন এবার ব্রেলভী শিক্ষার তথ্য ও তত্ব সংগ্রহ করে, কুরআন ও হাদীসের সাথে সাথে তাদের হানাফী ফেকার সাথেও তুলনা করি, তাহলে তত্ব মিলবে যে তাদের চিন্তা ভাবনা ও

শিক্ষার মিল কুরআন, হাদীস এমনকী হানাফী ফিক্হের সাথেও নাই।

আহমদ ইয়ার গুজরাঠী 'জাআল হক' পুস্তিকার ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন — ''কবরবাসীর সম্মান প্রদর্শনের জন্য গম্বুজ ইত্যাদি তৈরি করা শরীয়ত মতে জায়েয।''

''ওলামা, আওলিয়া ও সলেহীনদের কবরে অট্টালিকা তৈরি করা বৈধ কাজ, যদি তদ্বারা মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হয়, যাতে জনগণ সেই কবরবাসীকে তুচ্ছ মনে না করে'' (উক্ত পুস্তিকা ২৮৫ পৃষ্ঠা)।

পক্ষান্তরে হাদীসে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে যে, ''রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরকে চুনকাম করতে (পাকা করতে) ও তার উপরে গম্বুজ ইত্যাদি করতে নিষেধ করেছেন'' (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, হাকিম ও বায়হাকী)।

এইভাবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আলী রাযি আল্লাহু আনহুকে বিশেষ আদেশ করেছিলেন যে, ''তিনি যেন উঁচু কবরকে সমতল যমীনের বরাবর করে দেন'' (ইমাম মুহাম্মাদ লিখিত কিতাবুল্ আসার দ্রষ্টব্য)।

উমার ইবনুল হারিস (রাযিঃ) সুমামা (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ''আমাদের একসাথী রুমে মৃত্যু বরণ করলে, ফুযালাহ্ বিন্ উবাইদ (রাযিঃ) কবরকে যমীন বরাবর সমতল করতে বলেন, তদসহ একথাও বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে একথার আদেশ করতে শুনেছি'' (কিতাবুল্ আসার ইমাম্ মুহাম্মাদ)।

এবার হানাফী ফিকহের দলীল দেখুন ঃ— ইমাম সারখাসী হানাফী (রহঃ) মাবসূত নামী কিতাবের ২য় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন — ''কবরকে পাকা করা নিষিদ্ধ।''

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ''কবর পাকা করা কি অপছন্দনীয় কাজ?'' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ''হ্যাঁ''।

ইমাম সারখাসী হানাফী (রহঃ) মাবসূত কিতাবে বলেছেন— ''কবর পাকা করো না, কারণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কর্তৃক ইহা নিষেধের প্রমাণ আছে।''

কাযী খাঁন নিজ কিতাবে লিখেছেন—''কবর পাকা ও তার উপরে গম্বুজ যেন তৈরি না হয়, কারণ আবু হানাফী (রহঃ) কর্তৃক নিষেধ আছে।'' ফতোয়া কাযী খাঁন ১/১৯৪ পৃষ্ঠা।

ইমাম কাসানী হানাফী (রহঃ) এর বাণী — ''কবরকে পাকা করা অপছন্দ কাজ, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কবরের উপরে গম্বুজ ইত্যাদি তৈরি করা অপছন্দ করতেন। তাতে মালের অপচয় হয়, অবশ্য পানি ছিটাতে কোনো ক্ষতি নাই। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণিত আছে যে, পানি ছিটানোও মাকরূহ; কারণ এতে কবর মজবুত হয়।'' ইমাম কাসানী (রহঃ) লিখিত বাদায়েউস সানা এ পুস্তকের ৩২০ পৃঃ এ ধরণের দলীল হানাফী ফিক্হের মধ্যে অনেক আছে। যথা বাহরুর্রায়েক ২০৯ পৃষ্ঠা, বাদায়েউস্ সানাএ ১/৩২০, ফতহুল কাদীর ১/৪৭২ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার আলাদুর্রিল মুখতার ১/৬০১ পৃষ্ঠা, ফতোয়া বায্যাযিয়া ৪/৮১ পৃষ্ঠা, ফতোয়া হিন্দিয়াহ্ ১/১৬৬, কান্যুদ্দাকায়িক ৫০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

কাযী ইব্রাহীম হানাফী (রহঃ) মাজালিসুল আবরার কিতাবের ১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন — ''কবরের উপরে যে গম্বুজ তৈরি করা হয়েছে তা ভেঙে ফেলা ফরয। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিষেধ অমান্য করে করা হয়েছে। কাজেই মসজিদে যেরার ধ্বংস করার চেয়েও বেশি প্রয়োজন।''

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন —

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

অর্থাৎ ঃ ''আল্লাহ্ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লানত (অভিসম্পাত) বর্ষণ করুন, কারণ তারা নিজ নাবীদের কবরকে মসজিদ (সাজ্দার স্থান) করে নিয়েছে'' (বুখারী)।

এই হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও হানাফী ফিক্হের প্রকাশ্য দলীল। কিন্তু ব্রেলভী জাতির হঠকারিতা যে, কবরকে পাকা করা ও তার উপরে গম্বুজ ইত্যাদি করা যরূরী।

আহমদ রেযা খাঁন ব্রেলভী সাহেব বলেছেন — ''গম্বুজ ইত্যাদি তৈরি করা এইজন্য যরূরী যে, তাহলে পবিত্র মাযার ও সাধারণ কবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাবে। আর জন সাধারণের

দৃষ্টিতে ভয় ও সম্মানের সৃষ্টি হবে'' (মাজালিসুল আব্‌রার কাযী ইব্‌রাহীম ১২৯ পৃষ্ঠা)।

''তারপরে চাদর চাপানো ও মোমবাতি জ্বালানো এটা জায়েয, কারণ মাযারের উপরে কাপড় ও পাগড়ী রাখা হবে, জনসাধরণ সেটাকে ওলীর মাযার জেনে তার অবমাননা থেকে বিরত থাকবে। গাফিল জিয়ারতকারীদের অন্তরে ভীতি ও সম্মানের সৃষ্টি হবে। আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মাযারের আওলিয়া কেরামদের রূহ হাযির হয়'' (মাজালিসুল আবরার ৭১ পৃষ্ঠা)।

আরো লিখেছেন — ''কবরের সম্মানের জন্য মোমবাতি জ্বালানো জায়েয। তা হলে জনগণ জানতে পারবে ইহা বুযুর্গের কবর আর তাবার্রুক হাসিল করবে'' (ফতোয়া রিযবিয়ার সাথে যুক্ত বারিকুল মানার বিশমূয়িল মাযার ৪/১৪৪ পৃষ্ঠা)।

অন্য ব্রেলভী আলেম লিখেছেন— ''যদি কোনো কবর ওলীর হয়, তাহলে তার সম্মানার্থে ও জনসাধারণকে জানাবার উদ্দেশ্যে চেরাগ জ্বালানো জায়েয। জনগণ জানতে পারবে ওলীর কবর। ফলে তা হতে বরকত অর্জন করবে'' (আহমদ ইয়ার গুজরাঠী রচিত জাআল হক ৩০০ পৃষ্ঠা)।

এই হচ্ছে ব্রেলভী বড় হুযুরদের ফতোয়া, পক্ষান্তরে হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধ এসেছে।

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَ السُّرُجَ.

অর্থাৎ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কবর যিয়ারতকারিনী নারী ও কবরের উপরে সাজ্‌দার স্থান তৈরি এবং চেরাগ প্রজ্বলিতকারীগণের প্রতি লানত (অভিসম্পাত) করেছেন'' (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)। *(এই শব্দে হাদীসটি যয়ীফ - আলবানী দেখুন আহকামুল জানায়েয এবং সিলসিলাহ্ যয়ীফা ২২৫ - সম্পাদনা পরিষদ)*।

মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) মিশকাতের শরহ মিরকাতের ১/৪৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন — ''কবরের উপরে চেরাগ জ্বালার নিষেধের কারণ হচ্ছে তাতে মালের অপচয় হয়। তাছাড়া আগুন হচ্ছে জাহান্নামের নিদর্শন এছাড়া এতে কবরের অসম্মান করা হয়।''

কাযী ইব্‌রাহীম হানাফী কবর পূজার নিয়ম উল্লেখ করে লিখেছেনঃ—'' বর্তমানে কোনো কোনো পথভ্রষ্ট লোকেরা কবরের হজ্জ আরম্ভ করে দিয়েছে আর তার মনগড়া পদ্ধতি তৈরি করেছে। আর ধর্ম বিরোধী কাজের মধ্যে এটাও যে, জনগণ কবর ও মাযারের সামনে চরম কাকুতি মিনতি প্রকাশ করছে এবং তার উপরে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। কবরের উপরে চাদর চড়ানো, দারোয়ান বসানো, তাকে চুম্বন দেওয়া ও তার কাছে রূযী ও সন্তান ইত্যাদি চাওয়ার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নাই'' (মাজালিসুল আব্‌রার ১১৮ পৃষ্ঠা)।

স্বয়ং আহমদ ইয়ার গুজরাঠী ফতোয়া আলমগীরী হতে লিখেছেন, ''কবরের উপরে মোমবাতি জ্বালানো বিদ্‌আত।'' এভাবেই ফতোয়া বায্‌যাযিয়াতে আছে ''কবরস্থানে চেরাগ নিয়ে যাওয়া বিদ্‌আত, এর কোনো ভিত্তি নাই'' (জাআল হক ৩০২ পৃষ্ঠা)।

ইবনু আবেদীন লিখেছেন —''মাযার সমূহে তেল, মোমবাতি ইত্যাদির মানত মানা বাতিল'' (ইবনু আবেদীন শামী রচিত রদ্দুল মুখতার ২/১৩৯ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা হাসকাফী হানাফী (রহঃ) বলেছেন ''জনগণের পক্ষ হতে যে নযর ও নিয়ায (মানত ও সিন্নী) দেওয়া হয়, তা টাকা পয়সা রূপে হোক বা তেল ইত্যাদি রূপে হোক সর্বশ্রেণির ওলামাদের সিদ্ধান্তে তা বাতিল ও হারাম'' (হাস্‌কাফী রচিত রদ্দুল মুহতার ২/১৩৯ পৃষ্ঠা)।

ফতোয়া আলমগিরীর ১/১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখা আছে ''কবর আলোকিত করা জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার।''

আল্লামা আলুসী হানাফী (রহঃ) রূহুল্ মাআনী গ্রন্থের ১৫/২১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, ''কবরের উপর হতে চেরাগ ও মোমবাতি হঠানো যরূরী, আর কোনো মানত জায়েয নয়।'' এভাবে আরো একটি ফতোয়া— ''চাদর ইত্যাদি দিয়ে কবর ঢাকাও ঠিক নয়।''

ফতোয়া মাতালিবুল্ মুমেনীনে আরো একটি ফতোয়া ''ইহা সব বাতিল, একাজ সমূহ হতে বাঁচা দরকার'' (ফতোয়া আযীযিয়া ২৯ পৃষ্ঠা)। আরো একটি ফতোয়া ''প্রদীপ জ্বালানো ও চাদর চড়ানো হারাম'' (ফতোয়া শাহ রফিউদ্দিন ১৪ পৃষ্ঠা)।

হানাফী আলেমগণ আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ''তিনি এমন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে কাপড়

ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা হতে নিষেধ করেছিলেন।'' মাতালিবুল্ মুমেনীন।

ইসলামী শরীয়তে এসব বিদ্আতসমূহের কোনো প্রমাণ নাই। ইসলামের প্রথম যুগেও প্রমাণ নেই। এতে যদি ধর্মীয় কোনো উপকার থাকত, তাহলে সম্মানীয় সাহাবাগণ (রাঃ) ও তাবেয়ীগণ (রহঃ) বা তৎপরবর্তীদের মধ্যে একাজের প্রমাণ মিলত। বরং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আল্লাহ্র কাছে দুআ করেছিলেন — ''আল্লাহুম্মা লা তাজ্আল কাব্‌রী অসানাই ইয়ূবাদু'' অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমার কবরকে মেলার ক্ষেত্র করোনা যাতে তার পূজা আরম্ভ হয়ে যায়।'' মিশকাত বাবুল্ মাসাজিদ।

ব্রেলভী হুযূরেরা উরস্, মহফিলে মীলাদ, ফাতিহার মানত, কুল, ফাতিহা ইয়ায্দহম, চালিসা ইত্যাদি রূপে এধরণের অনেক বিদ্আত আবিস্কার করেছে, যাতে তার দ্বারা পেটের জ্বালা ঠাণ্ডা করতে পারে।

তারা লিখেছে — ''আল্লাহ্র অলীগণ আল্লাহ্র রহমতের গেট আর গেটেই দান পাওয়া যায়। ক্বুরআনে আছে 'هُنَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَا' এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম মারইয়ামের কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানের দুআ করলেন। তার অর্থ হল অলীয়ার কাছে দুআ করলে কবুল হয়''।

(১) ব্রেলভীদের এ ধৃষ্টতা দেখুন, ক্বুরআন মাজীদের মানের পরিবর্তন করে, নবুওতী সম্মান খাটো করে দেখাচ্ছে, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, অলীত্ব নবুওতী হতে উত্তম। এটাই আকীদা পথভ্রষ্ট সুফী ইবনুল আরাবীর। জাআল হকের লেখক আহমদ ইয়ার গুজরাঠী যাকারিয়া (রহঃ) এর মর্যাদা ও সম্মান মারইয়াম হতে ছোট করে দেখিয়েছে।

গুজরাঠী মাওয়ায়েযে নায়ীমীয়ার ২২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছে ''কবরের উরশে আওলিয়াদের খিদমতে উপস্থিতির সুযোগ মিলে আর এটা আল্লাহ্র নিদর্শনের সম্মান প্রদর্শন, এতে অনেক উপকার আছে।'' *('এতে কোনো উপকার নাই বরং গুনাহ্ আছে, হ্যাঁ, সিন্নী ও মানতে হুযুরদের পেটের জ্বালা ঠাণ্ডা হবে - অনুবাদক)* । আহমাদ রেযার এক ছাত্র লিখেছে — ''আওলীয়া কেরামদের কবরে উরস করা, ফাতিহা পড়া, বরকত লাভের উপায়। সুনিশ্চিত আল্লাহ্র অলীগণ মরার পর নিজ কবরে জীবিত আছেন। আর মরার পরে তাদের শক্তি বেড়ে যায়'' (বাহরে শরীয়ত ১/৫৬ পৃষ্ঠা)।

নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদীর রিসালা মু'জিযাতুল্ উযমা মুহাম্মদীয়াহ্ যা ফত্ওয়া সদরুল আফাযিলের সাথে যুক্ত তার ১৬০ পৃষ্ঠা সহ তার পরবর্তী পৃষ্ঠায় লিখেছেন—''উরস করা ও সেই সময় আলোক সজ্জা করা, বিছানা বিছানো, লংগর করা অর্থাৎ সর্বসাধারণের আহারের ব্যবস্থা শরীয়ত হতে প্রমাণিত এবং রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত।''

উক্ত প্রথা ব্রেলভী মনগড়া শরীয়তে বিনা দলীলে প্রমাণিত হতে পারে। *তাই বলে ইস্‌লামী শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ নাই। আর সুন্নাত নহে বরং জঘন্য বিদ্আত। ওর দ্বারা মুর্খ জনগণের অর্থে পীর সাহেবদের আলমারী ভর্তি হবে - অনুবাদক।* রেযবী ফত্ওয়ার সাথে যুক্ত ব্রেলভী সাহেবের হাজেযুল বাহ্রাইন পুস্তকের ২/৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে যে, মাযারে নামায পড়া ও তাঁদের রুহের কাছে মদদ চাওয়া বরকত অর্জনের উপায়।'' ফত্ওয়া রিযবিয়ার ১/৬৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে যে, ''অহাবীরা কবরে চুমু দেওয়াকে শির্ক বলছে, এটা তাদের বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত কথা।''

''গাইরুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করলে মানুষ মুশরিক হয় না'' (ফত্ওয়া রিয্বিয়া ১/২১০)।

কবরে তওয়াফ করা (চারিপাশে প্রদক্ষিণ করা) ব্রেলবী শরীয়তে জায়েয।

''যদি বরকত লাভের আশায় কবরের তওয়াফ করে তাতে কোনো ক্ষতি নাই'' (আমজাদ রিযবী লিখা — বাহরে শরীয়ত ১/১৩৩ পৃষ্ঠা)।

এই জন্য যে ''অলীদের কবর আল্লাহ্র নিদর্শন। তার তাযীম (সম্মান) করার হুকুম আছে।''

আহমদ ইয়ারের লেখা ইলমুল ক্বুরআন ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে ''কবরের তওয়াফকে শির্ক বলা ওহাবীদের ভ্রান্ত ধারণা, অতিরঞ্জিত ও বাতিল'' (হেকায়াতে রিযবিয়া ৪৬ পৃষ্ঠা)।

শাশ্বত সত্য একক ঐশী জীবন ব্যবস্থা

সেখ মহিম আলি

পরম করুণাময় চরম সত্য মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামীনের নামে শুরু করছি —

সত্যের বৈশিষ্ট্যই হল স্থায়িত্ব লাভ। সত্য অনির্বাণ, চিরস্থায়ী। কিন্তু এই মানব জীবন প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু অস্থায়ী জটিলতার জালে বন্দী। যার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে আমাদের পরিবেশ ও মননে। এর একমাত্র স্থায়ী প্রতিষেধক হল শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা তথা শাশ্বত ঐশী জীবন বিধান। যে বিধানের সফল প্রয়োগ শুধু ব্যক্তি জীবনে নয় - ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিপ্লব, শান্তি, শিল্প ও বাণিজ্য সহ সর্বস্তরের সিঁড়ি ভেঙে পারলৌকিক আলোকতীর্থেও এর সুনিপুণ অবাধ বিচরণ। কিন্তু যুগে যুগে মোহাচ্ছন্ন মানব জাতির একটা বৃহৎ অংশ অহংকার বশতঃ এই ঐশী সত্যকে অস্বীকার করে এসেছে। তবে সত্য যেহেতু চিরস্থায়ী, তাই সেই সত্যকে অবিশ্বাসী দাম্ভিকরা নিভিয়ে দিতে পারেনি। যুগে যুগে আবহমানকাল ধরে এক বিশাল শয়তানী চক্র, এই সত্যকে নির্লিপ্ত করতে ও তার জ্যোতি ধ্বংস করতে খড়গহস্ত। মিথ্যা যেহেতু ধ্বংস হবার জন্যই, তাই অতীতের ফেরাউনদের মতই বর্তমানের কুচক্রীরাও ধ্বংস হতে অনিবার্য। মিথ্যার শক্তি যতই বৃহৎই হোক না কেন, একসময় সেই মিথ্যা স্তিমিত হতে বাধ্য, পরাজিত হতে বাধ্য। অন্যদিকে সত্য সর্বদা অপরাজেয়, অপরিবর্তনীয়। ইতিহাস তার দৃষ্টান্তমূলক সাক্ষী। সত্য সকল কিছুর উর্দ্ধে। এই লেখনীও সেই মহাসত্য জীবন ব্যবস্থারই দার্শনিক উদ্ঘাটনের প্রয়াস মাত্র।

জীবন পদ্ধতি বা জীবন ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যা আমাদের সামগ্রিক জীবনকে ধারণ করে (অর্থাৎ ধর্ম)। সুতরাং এই ভূমণ্ডলে জীবন যতদিন থাকবে জীবন ব্যবস্থা তথা ধর্মের প্রয়োজনও ততদিন থাকবে। যদিও যুক্তি হিসাবে অবশ্য অনেকেই বলে থাকেন যে জীবন পদ্ধতির জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, জীবন পদ্ধতি আমরা নিজেরাই গড়ে নিতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমনই যুক্তির উপর নির্ভর করে, মানব মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা দিয়ে নতুন নতুন জীবনপদ্ধতি গড়ে তুলেছিল ফেরাউন (দ্বিতীয় রামেসিস), সাদ্দাদ, নমরূদ প্রমুখ ফেরাউনগণ। প্লেটো, রুশো, ভল্টেয়র মানুষের জন্য নতুন জীবন পদ্ধতির দিক নির্দেশ করেছিল। হেগেল, কার্ল মার্ক্স মানব সমাজের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে নতুন জীবন দর্শনের রূপরেখা এঁকে গেছে এবং সে মোতাবেক লেনিন, মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে সর্বাত্মক বিপ্লবও সাধিত হয়েছে রাশিয়া ও চীনে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র নামক এক নয়া সমাজ পদ্ধতি চালু আছে (প্রাচীন গ্রীসিয় সমাজ সভ্যতার নবতর সংস্করণ হিসাবে)। কিন্তু এগুলোর কোনও একটিও কি রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে শান্তির সন্ধান দিতে পেরেছে? শ্রেণি স্বার্থের ধ্বজা তুলে সাম্যবাদের নামে সমাজবাদী দেশগুলি কি জনতাকে দাসে পরিণত করেনি? আর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে লুণ্ঠন-শোষণের অবাধ সয়লাব কি বয়ে যাচ্ছে না? অশান্ত, অস্থির মানুষকে ঘুমের বড়ি খেয়ে নিদ্রা যেতে হয় কোন কারণে? এগুলো সবই হল মানব মস্তিষ্ক প্রসূত মিথ্যা জীবন ব্যবস্থার ও ধর্মবিহীন সমাজবাদী শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের কুফল। কারণ সকল প্রকার সমস্যার সমাধান নিহিত আছে স্রষ্টা নির্দেশিত একমাত্র ঐশী জীবন পদ্ধতিতেই।

উদাহরণ স্বরূপ সাপের বিষের কথা বলা যেতে পারে। আমরা সাপের মধ্যে তার বিষ দাঁতকে সব থেকে বেশি ভয় পায়। কারণ সাপের বিষের প্রভাবেই যা ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই বিষ দাঁতকেই যদি উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সাপের বিষের প্রভাব হেতু ক্ষতির আর আশঙ্কা নেই। তাই আর কোনো ভয় নেই? ঠিক তেমনই মানুষের বিষ দাঁত হল তার স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সকল প্রকার বিপর্যয়, অশান্তি ও অনর্থের মূল কারণ হল মানুষের এই স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। স্বার্থপরতা অন্যায়ের বাহন আর স্বেচ্ছাচারিতা হল সেই অন্যায়ের অমোঘ অস্ত্র। মানুষ যখন মহান স্রষ্টার সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে সত্যিকার অর্থে আত্মসমর্পণ করে, তখন তার স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার কোনো সুযোগই আর থাকে না। তখন সে প্রকৃত অর্থেই একমাত্র স্রষ্টার দেওয়া বিধানাবলীরই প্রতিপালনকারী ও প্রয়োগকারী হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ধর্মের অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় পার্থিব জীবনের সুষ্ঠ পরিচালনায় পক্ষপাতহীন ও

পরকালমুখী ব্যবস্থা লাভের জন্য সত্য ধর্ম তথা ঐশী জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ অপরিহার্য।

তবে উল্লেখ্য, মানুষ সাধারণভাবে আত্মকেন্দ্রিক। উপরন্তু মানুষের আবার নিজের সম্পর্কে, জগত-জীবন সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। সর্বোপরি, মৃত্যু পরবর্তী জীবন মানুষের জ্ঞানের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। অথচ সসীম পার্থিব জগতের সীমিত সময়ে মানুষের কার্যাবলীর উপরই নির্ভর করে পরকালীন অসীম জগতের ফলশ্রুতি। সুতরাং এই ইহকাল ও পার্থিব জীবন সীমিত হলেও মূল্যের দিক দিয়ে খুবই গুরত্বপূর্ণ, কারণ এটাই অনন্ত জীবনের সূচনাকাল। সেই অনন্ত অসীম পারলৌকিক সাফল্যের জন্য কী ধরণের জীবন আবশ্যক — সেই সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে এই পৃথিবীতেও সফল জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। তাই সম্পূর্ণ জীবন বিধান সম্বলিত অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ ও অবিকৃত ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে বিদ্যমান সেই একমাত্র সত্য ধর্মকে অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ করা প্রতিটি মানুষের আশু কর্তব্য।

মহান স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করার সাথে সাথে চিন্তা ও কর্ম করার স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যুগে যুগে তাঁর পাঠানো বার্তাবাহকের মাধ্যমে চিহ্নিত করে দিয়েছেন মানুষের ও বিশ্বের মঙ্গল, শান্তি ও স্বস্তির সর্বোত্তম পথকে। এক্ষণে মানুষের দায়িত্ব হল স্রষ্টার ঐ বিধান অনুযায়ী ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকা ও তা প্রতিহত করা। তবে এই বিধান মান্য করা বা লঙ্ঘন করা মানুষের স্বাধীন ব্যাপার। স্রষ্টার বিধান মান্য করে ভাল কাজ করতে পারলে স্রষ্টার প্রশংসা করা উচিত কারণ তিনিই আমাদেরকে ভাল কাজ করার শক্তি ও সামর্থ দেবার পাশাপাশি উত্তম পথ ও কর্মসমূহ চেনার সুযোগও তিনিই করে দিয়েছেন। অন্যদিকে মানুষ যখন অন্যায় কাজ করে, মন্দ পথে চলে - তখন সে স্রষ্টার বিধান লঙ্ঘন করেই সেগুলো করে এবং কর্ম সম্পাদনের যে শক্তি সামর্থ বিশ্বপ্রভু দিয়েছেন তার অপব্যবহার করে। সুতরাং কেউ মন্দ কাজ করলে বা মন্দ পথে চলে সত্য ধর্মের অনুসরণ না করলে, তার দায় বা দোষ নিজেকেই বহন করতে হবে, বিশ্বপ্রভুকে নয়।

এই জীবনের সমস্যা সংকুলে পথ অতিক্রম করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতেই হয়। আর সেই সংকটময় মুহূর্তে স্রষ্টার প্রতি আস্থা আমাদের জীবনের চলার প্রেরণা জোগায়। তবে উল্লেখ্য, স্রষ্টা তো কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্রষ্টা নন বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির স্রষ্টা। নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, স্বদেশী-বিদেশী কিংবা সবল-দুর্বল; স্রষ্টার কাছে সবাই সমান। জন্মগত কারণে এরা কেউ একে অন্যের চেয়ে ছোটো বা বড়ো নয়। মানুষ হিসাবে তারা সকলেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই বাস্তবে দেখা যায় জাতি-ধর্ম -গোত্র-বংশ-ভাষা-লিঙ্গ প্রভৃতি ভেদে প্রত্যেক মানুষের দৈহিক গঠন প্রায় এক এবং সকল মানুষের রক্তের বর্ণও এক, সে অনুসারে প্রতিটি মানুষের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে যদি একাধিক স্রষ্টা হত তাহলে সকল মানুষের রক্তের রঙ লাল না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হত কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বাস্তবিকই কোনও প্রতিষ্ঠান বা স্কুলের যদি একাধিক পরিচালক বা প্রধান শিক্ষক থাকেন তাহলে তাঁদের অনিবার্য মতদ্বন্দ্বের ফলে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ব্যহত হতে বাধ্য। অনুরূপভাবেই এই বিশ্বব্যবস্থাও যদি একাধিক স্রষ্টা দ্বারা পরিচালিত হত তাহলে তার শৃঙ্খলা তথা ভারসাম্য নষ্ট হত। আসলে সৃষ্টিকর্তার একত্বকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমেই নিহিত আছে সমস্ত মানবতার ঐক্য। তাই পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলিতে স্রষ্টার একত্বের সাক্ষ্যই ঘোষিত হয়েছে। ছন্দগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'একম এবদ্বিতীয়ম' অর্থাৎ 'তিনি এক ও অদ্বিতীয়'। পবিত্র কুরআনেও এর প্রতিফলন, 'তাঁর সাথে কোনো উপাস্য নেই। থাকলে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অন্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করত।" ''যিনি আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো অংশী নেই।" সার্বভৌমত্বকে ভাগ করলে স্রষ্টার মর্যাদাকে অবশ্যই ক্ষুণ্ন করা হয়। তাই বলা হয়েছে '' তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর কেউই তাঁর সমতুল্য নয়" এবং প্রকৃত স্রষ্টা তিনি ''যিনি যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী। তারা যে অংশী সাব্যস্ত করে তিনি তার অনেক উর্ধ্বে" (আল্ কুরআন)। যজুর্বেদের ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, ''নাতস্য প্রতিমা অস্তি" অর্থাৎ স্রষ্টার কোনো প্রতিমা নেই। কেনোপনিষদ ১ নং খণ্ডের ৬ নং শ্লোকে রয়েছে ''অন্ধাত্মা প্রবেশান্তি যে অসাম্ভূতিম উপাস্তে" অর্থাৎ তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা

প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা করে (যেমন মাটি, পাথর, বাতাস, আগুন ইত্যাদি)। সৃষ্টি জব হল মরণশীল ও জড় হল অচল-অক্ষম এবং সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভরশীল।

মানব জাতি যেহেতু বারবার স্রষ্টা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য জ্ঞান করে তাদের পূজা করে। তাই স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ও গোত্রে স্রষ্টার পক্ষ থেকে অনেক দূত এসেছেন। সমস্ত দূতগণের মূল শিক্ষা ছিল একক সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে উন্নত চরিত্র গঠন। তার প্রমাণ মেলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মীয় পুস্তকের পাতায় পাতায়। আর এই দূতগণের মধ্যে সর্বশেষ দূত হলেন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) , যিনি এসেছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। আধুনিক ইতিহাসে আরব তথা পৃথিবীর অন্ধকারময় যুগে তিনিই সর্বপ্রথম নারীর অধিকার সূচিত করেন। অথচ গণতন্ত্রের লালনভূমি ইংল্যান্ড সেই অধিকার দিয়েছে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে The Married Women Act পাশের মাধ্যমে। তিনি যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করেন এবং দাসপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁর আগমনেই আমরা আজ এই পৃথিবীতে মানবাধিকার, সাম্য, ন্যায়, নারী অধিকার প্রভৃতি পরিভাষাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। স্রষ্টার এই শেষ দূতের আগমন বার্তা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে দেওয়া হয়েছে। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্ট, দি বুক অফ ইসাইয়া (২৯:১২) এবং ঋগ্বেদ সহ (১:১৩:৩, ১:১৮:৯, ১:১০৬:৪, ১:১৪২:) যজুর্বেদ ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহেও স্রষ্টার শেষ দূত হিসাবে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, পার্সী সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সমূহেও মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং দ্বীন বা ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রশ্নাতীত।

এক্ষণে, এ হেন মুহূর্তে সবথেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলি উদয় হতে পারে সেগুলি হল —

১। স্রষ্টা (ঈশ্বর) কি সত্যই বিরাজমান?

২। আমাদের সৃষ্টি কি হঠাৎ বা বাই-চান্স হয়েছে?

৩। স্রষ্টা/প্রতিপালক আল্লাহ্ কি কেউ আছেন?

৩। আমরা কোথা থেকে এসেছি?

নাস্তিকরা বলতে পারেন যে, হয় আমরা শূন্য (কোনো কিছু নয়) থেকে এসেছি অথবা আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছি; নতুবা কোনো কিছু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে। শূন্য থেকে যেমন শূন্য ছাড়া কিছু আসে না, তেমনই কোনো কিছু সৃষ্টি হতে গেলেও অবশ্যই তাঁর আগে কোনো কিছু থাকতে হবে। অর্থাৎ কথাটা অনেকটা এরকম যে, একই সাথে আমাদের অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের অস্তিত্ব নেইও। অথবা আমাদের মায়েরা নিজেরাই নিজেদের জন্ম দিয়েছেন।

আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার যে এই মহা বিশ্বজগতের বয়স আনুমানিক ১৩ লক্ষ কোটি বছর। এখানে মানুষের একটি প্রোটিন হঠাৎ করে সৃষ্টি হতে গেলেও সময় লাগে প্রায় ৬৩৪০ লক্ষ লক্ষ কোটি বছর। অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর বয়স ৪৫০ লক্ষ বছর। এমতাবস্থায় এটা বলা কি সমীচীন যে আমাদের সৃষ্টি বাইচান্স হয়েছে? প্রত্যেকটা মানুষের শরীরের শতকরা ১৮.৫ ভাগ কার্বন, শতকরা ৩.৩ ভাগ নাইট্রোজেন, শতকরা ৯.৫ ভাগ হাইড্রোজেন এবং শতকরা ৬৫ ভাগ অক্সিজেন। প্রত্যেক মানুষের শরীর গড়ে প্রায় ১৪ গ্যালন জল, ২৬ পাউন্ড চারকোল ও ৩ পাউন্ড বাতাসের সংমিশ্রণ যুক্ত। এক্ষণে যদি এই সবগুলিকে একটি ব্যাগ বা থলির মধ্যে ভরে রাখা হয়, তাহলে আমাদেরকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে সেখান থেকে একটা জীবন্ত মানুষ বেরিয়ে আসার জন্য? এরপরেও কি এটা বিশ্বাসযোগ্য যে আমাদের বাইচান্স সৃষ্টি হয়ে গেছে? আমাদের নিকট মডার্ণ টেকনোলজি যা কিছু বিদ্যমান, তা দিয়ে আমরা এমন একটা রোবটও তৈরি করতে সমর্থ হয়নি যেটা একেবারে মানুষের মতই পারফেক্ট। আমাদের যা কিছু উন্নত টেকনোলজি আছে তা দিয়ে এমন একটি ক্যামেরাও তৈরি করতে সমর্থ হয়নি যেটা মানুষের চোখের মত ৫৭৬ পিক্সেল বিবর্ধনযুক্ত। আমাদের যাবতীয় কিছু টেকনোলজি দিয়ে এখনও তেমন একটা হৃদপিণ্ড তৈরি করা সম্ভবপর হয়নি যেটা কোনোরকম সমস্যা ছাড়াই প্রত্যহ ৭২০০ লিটার রক্তকে নির্দ্বিধায় পাম্প করতে পারে। এমনকি সমস্ত টেকনোলজি ব্যবহার করে এখনও তেমন একটি কিডনিও তৈরি করা যায়নি যেটা সবসময়ই সপ্তাহের প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা করে কাজ করে (২৪x৭) এবং এরপরেও কি বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের বাইচান্স সৃষ্টি হয়েছে অথবা কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে?

একজন সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্বশক্তিমান। একজন সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্বজ্ঞানী। একজন সৃষ্টিকর্তা যিনি তাঁর সৃষ্টি সদৃশ নয়। আল্লাহ্, যিনি যিশু, মুসা এবং মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সকলেরই প্রভু। আপনাকে যদি কেউ দশ লক্ষ কোটি টাকা দেয় অবশ্যই তার প্রতি সারাজীবন চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। অথচ যিনি আপনাকে কোটি কোটি টাকার থেকেও মূল্যবান সম্পদ প্রাণবায়ু দিয়েছেন ও বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কী করেন? আপনার কি উচিত নয় তাঁর গুণগান করা? সেই আল্লাহ্র উপাসনা করা? আপনার কি তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়? সুতরাং আসুন সে কথায় যা আমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন। তা হল আমরা মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর উপাসনা (স্তুতি) করবো না।

মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন এই সত্যের বার্তা নিয়ে সর্বশেষ দূত হিসাবে পৃথিবীতে এসেছিলেন তখন তাঁকে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চলেছিল তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন। দিকে দিকে বেড়ে গিয়েছিল তাঁর শত্রুর সংখ্যা। তবে শত্রুরা তাঁর বিরোধিতা করলেও তাঁকে দুটি উপাধিতে ভূষিত করেছিল, একটা হল আল্ আমিন (বিশ্বস্ত) এবং অপরটি হল আস্ সাদিক অর্থাৎ সত্যবাদী। কারোর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা যখন প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে তখন তার শত্রুরাও তাকে সে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাবোধ করেনা। আর স্রষ্টার এই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত দূত জানিয়েছেন যে স্রষ্টার কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। স্রষ্টার কাছে প্রতিটি কর্মের জবাবদিহির চেতনা নিয়ে ইহকালের জীবন কাটাতে হবে। অবিশ্বাস ও মন্দ কর্মের প্রতিফল স্বরূপ পরকালের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে জাহান্নামে (নরক)। অপরপক্ষে বিশ্বাস ও সৎকর্মের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতের (স্বর্গ) আনন্দময় জীবনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্রষ্টার প্রত্যেক দূতেরাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা বলে গেছেন।

সম্মানিত পাঠকগণ, একটু ভেবে দেখুন, পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি তার বিশাল আকৃতির তুলনায় আমাদের অস্তিত্ব দৃষ্টি গোচরের অযোগ্য। এই বিশাল পৃথিবী আবার ঐ মিটমিট করা তারার তুলনায় একটা বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু বিশাল বপু এই নক্ষত্রমণ্ডল আমাদের গ্যালাক্সি ছায়াপথের গায়ে ক্ষুদ্র এক তিল মাত্র। তাই বলে ছায়াপথের গর্বের কিছু নেই। কারণ অন্তহীন মহাকাশ জগতে লক্ষ লক্ষ কোটি গ্যালাক্সির মাঝে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সিও অনুজ্জ্বল এক ক্ষুদ্র বিন্দু সমতুল্য। এইভাবে বৃহত্তরের ঊর্ধ্বমুখী এই যাত্রার কোথায় পরিসমাপ্তি এবং কোথায় সিদরাতুল মুনতাহা - তা আমরা কেউ জানিনা। তারও অনেক উপরে সমগ্র মহাজগৎ তথা সব সৃষ্টি জুড়ে সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টার আরশুল আজিম, যিনি পরম করুণাময় ও সর্বপ্রশংসার অধিকারী, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ-মহাকাশ সমূহের নিয়ন্তা। আমরা মানব সম্প্রদায় সত্যই কত ক্ষুদ্র ও অসহায়, আর বিশ্ব প্রভুর কি অসীম দয়া আমাদের উপর, তাঁর প্রতি সত্যিই আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ইসলাম ধর্ম এই মহা সত্য উপলব্ধিরই এক নিদর্শন তথা পরিপূর্ণ একক ঐশী জীবনব্যবস্থা। ইসলাম সত্যের আওয়াজ 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ পূজ্য নয় এর স্বরূপে এই মহান সত্যের বার্তা দুনিয়াতে পেশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সত্যতা এই পৃথিবীতে সার্বিকভাবে অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান। ইসলাম হল এমনই এক সত্য, যা অনাদি এবং অনন্ত। অধুনা বিশ্বে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইসলাম কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মানবতার জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য। সুতরাং আসুন, সেইপরম স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়ে শাশ্বত সত্য ইসলামকে আঁকড়ে ধরে ঐশী জীবন বিধান তথা কুরআন ও হাদীস অনুসারে নিজ নিজ জীবন গড়ে তুলি। ইসলাম হল মানুষের স্বভাব ধর্ম। মানুষের বিবেক যা বলে ইসলাম তাই করতে বলে। বিবেক হল মানব মন ও মানব মস্তিষ্কের জন্য স্রষ্টার দেওয়া বিধিবদ্ধ একটা প্রকৃতি। মহাস্রষ্টার বার্তাবাহকগণ এই মানব প্রকৃতিকে সাহায্য ও শক্তিশালী করার জন্যই পৃথিবীতে আগমন করেন। জাগতিক জীবনে মানুষ যাতে ক্ষতি ও অন্যায় অবিচার থেকে বাঁচতে পারে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে এবং পরকালে যাতে চিরন্তন শান্তির জীবন লাভ করতে পারে - তারই পূর্ণাঙ্গ একক প্রাকৃতিক জীবন বিধান হল ইসলাম।

অতীতের সমস্ত একত্ববাদী ধর্মকে ইসলাম স্বীকার করে, অতীতের সব নাবী-রসূল তথা স্রষ্টার দূতগণকে ইসলাম সম্মান করে। অতীতের এই ধর্মগুলিকে যারা পূর্ণভাবে পালন করে চলতে

চায়, তাদের সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। তবে ইসলাম নীতিগত ও স্বাভাবিক কারণেই মনে করে যে অতীতের ধর্মগুলির কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। বাস্তবেও এর প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় যে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মেরই ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অবিকৃত অবস্থায় নেই। সর্বকনিষ্ঠ ও সামনের সর্বযুগের জন্য পরিকল্পিত ধর্ম হিসাবে ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক দুই জীবনের জন্যই অপরিহার্য একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্‌র কোনো কল্যাণ করে না, এই ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণকারী তথা সকল মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য। এই কল্যাণ মানুষের ইহকাল (পার্থিব জগৎ) ও পরকাল (আখেরাত) উভয় জগতের জন্যই। এই মূল বিষয়টা বুঝে নিলেই ইসলাম ও মানুষ, ইহজীবন ও পরজীবন - সব কিছুকেই ভালবাসা যাবে, জীবন হবে অতি সুন্দর ও সহজ-স্বাভাবিক।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের সফলতা ও মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্যর্থ পন্থার অনুসারী হয়ে একবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক যুগে এসেও মানবতার মুক্তি আসছে না, বরং মানবতা ক্রমে আরও অবরুদ্ধ ও নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে। অথচ এই পথের দিশা দেবার জন্যই যুগে যুগে গোত্রে গোত্রে আগমন হয়েছে অসংখ্য নাবীগণের (আলাইহিস্ সালাম)। আর প্রত্যেক নাবীই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের (তাওহীদ) দিকে একই আহ্বান - ইসলাম। এতেই মানুষের মুক্তি, এটাই মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল, যা চিরন্তন ও শাশ্বত। সুতরাং আসুন, সমস্ত মতবাদকে পরিত্যাগ করে, বহুত্ববাদ ও শির্‌ককে পরিহার করে ঐশী জীবন বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও সঠিক হাদীস অনুসারে পরিচালিত হয়ে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে গড়ে তুলি। কোন তন্ত্র, মন্ত্র, হুজুর, পীর, দরবেশের আনুগত্য না করে সরাসরি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আনুগত্য করে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে যাই। আল্লাহ্ আমাদের কবুল করুন — আমীন।

ইসলামের দুশমনদের স্বরূপ-যুগে যুগে

আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকারিয়া

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.

অর্থাৎ আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলিমদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদের পাবেন (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৮২)।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় নাবীকে এই আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন। কেন এই সতর্কতা সেটাই আলোচনার উপজীব্য।

এ বিশ্ব জগৎ স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি। জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, তৃণলতা দিয়ে সাজানো। আর এই সমস্ত সৃষ্টির সেরা হল মানুষ। তাই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মধ্যে দুটি গুণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন (ক) পশুত্ব ও (খ) যুক্তিবাদ। সব সৃষ্টির মধ্যেই পশুত্ব আর কেবল মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায় উভয় গুণের সমাহার। তাই যুক্তিবাদের জন্যই সে সৃষ্টির সেরা। কখনও কখনও মানুষ যুক্তিবাদ ছেড়ে নেমে আসে পশুত্বের সীমানায়। অত্যাচারের কৃপাণ হাতে তুলে নেয়। বিভেদের বীজ বোনে মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সাদায়-কালোয়।

কুরআনে বলেছে, বহুত্ববাদী মুশরিক ও ইহুদীদেরকে তুমি কঠিন শত্রুরূপে পাবে। কুরআনের কথা অভ্রান্ত ।

ইসলামের শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তৎকালীন সময়ে মক্কার অভিজাত কুরায়েশ বংশের মানুষ। আব্দুল মুত্তালিব ও আবু তালিবের বংশধর। নবুঅত লাভের পর আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচারের জন্য তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অমানসিক অত্যাচার আপন-পর সকলের কাছ হতে। সাজদার সময় চাপিয়ে দিয়েছে উটের ভুঁড়ি, যাতে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। মরুভূমির তপ্ত বালুতে অত্যাচারিত হতে হয়েছেন। শেষমেশ অতি প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করতে হয়েছে মদীনায়। ইহুদীদের সীমাহীন অত্যাচারে ও কিন্তু থেমে থাকেনি শেষ নাবীর একত্ববাদের প্রচার। বাধা বিপত্তি মাথায় নিয়েও বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে

দিয়েছেন আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে। চাচা হামজার মৃত্যু, ওহুদ প্রান্তরে খালিদ ও ইকরিমার অস্ত্রের ঝনঝনানির সামনেও অবিচল। রটে গেল আল্লাহ্‌র নাবী মারা গেছেন। শেষ নাবীর অভয় বাণী আমি মরিনি তোমরা কে কোথায় আছ ছুটে এসো। আল্লাহু মা'আনা। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে। ইসলাম শেষ হল না।

ইহুদীরা জীবিত অবস্থায় শেষ নাবীর প্রচারকে শত চেষ্টায় বাধা দিতে না পেরে তাঁর মরণের পরেও প্রতিশোধ তুলতে চাইল। শেষ নাবীর লাশ চুরির চক্রান্ত হল। সেখানেও খলিফা নূর-উদ্দীনের চেষ্টায় পর্যুদস্ত হল। শত রকমের শত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েও তারা থেমে থাকেনি। অদ্যাবধি তাদের চেষ্টা জারি রয়েছে। চেষ্টার রকম ফের হয়েছে মাত্র। বর্তমানে বহুত্ববাদী মুশরিক ও ইহুদীরা একজোট হয়ে আমদানী করছে নিত্য নুতন কৌশল। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য।

বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে মুসলিমরা বিভিন্ন স্থানে নির্যাতীত ও নিপীড়িত। অথচ সংখ্যায় মুসলিমরা বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০০২ সালে ৬ সেপ্টেম্বর ইন্টারনেটে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্ব জনসংখ্যার ৩৩% খৃষ্টান ও ২২% মুসলিম। শতকরা হিসাবে ইহুদীদের সংখ্যা উল্লেখ করার মত নয়। উক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী মুসলিম ১৩০ কোটি আর ইহুদী ১ কোটি ৪০ লক্ষ সর্ব সাকুল্যে।

জন সংখ্যার পাশাপাশি মুসলিমদের হাতে প্রচুর সম্পদ। বিশ্বের $\frac{(}{(}$ অংশ তেল সম্পদ তাদের হাতে। ২০০৩ এর ১৮ জানুয়ারী 'The Guardian' পত্রিকায় Lan Roberts এর তথ্য অনুযায়ী শুধু ইরাকেই ১২২ বিলিয়ন ব্যারেল তেল রয়েছে। আর এই তেলের জন্যই যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করেছে বলে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক সরাসরি মন্তব্য করেছেন Lan Roberts এর মন্তব্য "The US economy needs oil, like junkle needs heroin" বিশ্বের রবার সম্পদের ৭০%, পাট সম্পদের ৭৫%, মশলার ৬৭% সম্পদের মালিকানা মুসলিমদের হাতে।

মুসলিমদের হাতে মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার পরও কেন মুসলিমরা এত পিছিয়ে? অথচ ইহুদীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিতে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবও যথেষ্ট।

বর্তমানে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের তুলনায় পিছিয়ে। আল্লাহ্ তাআলা বর্তমান মুসলিমদের প্রতিভা দান করেননি বা অমুসলিমদের চেয়ে কম দিয়েছেন—একথা ভাবার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি (খায়ের উম্মাহ) বলেছেন এবং আল্লাহ্‌র যমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা কাউকে যোগ্যতার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না (২:২৮৬)। যেহেতু তিনি মুসলিম উম্মাকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন এবং খেলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই বর্তমান মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে তাদের মেধা ও যোগ্যতা যথাযথ ভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ার ফলস্বরূপ বিশ্বে অমুসলিমরা নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অতীতে মুসলিমরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে ছিল, তখন বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলিমদের হাতেই ছিল। বর্তমানে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের তুলনায় পিছিয়ে থাকার কারণে দুনিয়ার পরিচালক হওয়ার পরিবর্তে পরিচালিত, শাসক হওয়ার পরিবর্তে শাসিত। পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামের নৈতিক চরিত্র না থাকলেও মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও দুনিয়া পরিচালনার যোগ্যতা তুলনামূলক ভাবে বেশি রয়েছে। তাই তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ্ যদি ইসলামী নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বস্তুগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে দুনিয়ার কর্তৃত্ব তাদের হাতে আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্। শুধু বস্তুগত চাকচিক্যে সমাজ দীর্ঘদিন চলতে পারে না। সমাজের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নৈতিক শক্তির উপর।

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। আর জ্ঞানের অন্যান্য বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরযে কিফায়াহ্।

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দির জীবনে মিডিয়ার প্রভাব অপরিসীম। মিডিয়া বিহীন জীবন ভাবাই যায় না। দু'ধরণের মিডিয়া। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, লিফলেট, পোষ্টার ও চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সব রকমের খবরই পাওয়া যায়। কোনোটা অনাবিল আনন্দ দেয়, আবার কোনোটায় প্রাণ সংশয়ের উপক্রম হয়। আমার মনে আসছে ১৯৬৪ সালের শেষের দিকের কথা। পড়ছি কোলকাতার মৌলানা আজাদ (গর্ভঃ) কলেজে, থাকছি বেকার (গর্ভঃ) হোস্টেলে। ডাইনিং হলে খেতে খেতে আসামের আব্দুল করিম ভাই বললেন, জাকারিয়া, রায়ট হতে পারে। অজপাড়া গাঁয়ের ছেলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম সেটা আবার কী? উত্তর পেলাম

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কারণ আখেরী নাবীর একটা ছবি। এক হাতে তরবারি আর অন্য হাতে মদের পেয়ালা। সেই রাতেই শুরু। হিন্দু-মুসলিমে হানাহানি। রাজাবাজার, ফুলবাগান, খিদিরপুর ও বৈঠকখানার রাস্তা নর রক্তে রঞ্জিত হল। তিনদিন হোস্টেল বন্দী থাকার পর মিলিটারী শাসনের মাঝে দু'হাত তুলে প্রাণটা নিয়ে চলে এসেছিলাম। আর এম.এ. পড়তে কোলকাতা যাইনি। সেদিনের ঘটনার নায়ক ছিল প্রিন্ট মিডিয়ার আড়ালে কিছু নরাধম পশু। কয়েক মাসে আগেও আবার এ রকমই একটা ঘটনা ইলামবাজারে। এক অমুসলিম নরাধম হোয়াট্সঅ্যাপে পোষ্ট করেছে একটি লেখা শেষ নাবীর সম্পর্কে। কুরুচিকর অশ্লীল মন্তব্যে ভরা। তার লাভ কী হয়েছে জানিনা। তবে দুটি তরতাজা প্রাণ চলে গেছে তারই ধাক্কায়। এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলেছে। ঘটাচ্ছে বহুত্ববাদি মুশরিকরা। ইসলামের চির শত্রু বহুত্ববাদী ও ইহুদীরা।

মিডিয়া বর্তমান বিশ্বকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। একটা ভাল মানুষ বা জাতি মিডিয়ার অব্যাহত অপপ্রচারের ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে খারাপ হয়ে যেতে পারে। মিডিয়ার প্রচারণার ফলে কোনো আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। দুঃখজনক বাস্তবতা, বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংস্থাগুলো ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। রয়টারের ৮০% কর্মচারী ইহুদি, অ্যাসোসিয়েট প্রেসের ৮০% মালিকানা ইহুদীদের, আমেরিকান ব্রডকাষ্টিন করপোরেশন, সি.এন.এন. ফ্রান্স নিউজ, বি.বি.সি. ইত্যাদি সংবাদ সংস্থা ইহুদী নিয়ন্ত্রিত। এছাড়াও নিউইয়র্ক টাইমস্, দি গার্ডিয়ান, ওয়াশিংটন পোষ্টও। ইহুদীরা মুসলিমদের চিরশত্রু। তাই তারা আন্তর্জাতিক বাজারে মুসলিমদের মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে তারাই ইসলামকে কোণঠাসা করতে চায়। ফ্রান্সের শার্লে এবদোর ঘটনা তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ। মূলে হাত পড়ল না। মুসলিমদের হাতে এদেরকে ঠেকাবার অস্ত্র নেই। ওদের অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার কোনো আন্তর্জাতিক মানের শক্তিশালী মাধ্যম নেই। মুসলিম দেশগুলোতেও তাদের দালালরা একই পরিভাষা ব্যবহাক করে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিমদের মধ্যে মিথ্যা প্রচারনায় লিপ্ত রয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের মিথ্যা প্রচারনায় মুসলিমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েও উল্টে টেররিষ্ট হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে।

জীবন গড়ার ক্ষেত্রে, সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি মস্ত বড় হাতিয়ার। যে কোনো মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত চিন্তা শক্তি সর্বোত্তম কাজে লাগালেই পৃথিবীতে বড় অবদান রাখতে পারেন। ইমাম বুখারী সহ হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের অবদান, বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার, তাঁদের চিন্তা শক্তির সর্বোত্তম প্রয়োগের ফল। তাই ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য ইসলামে যথার্থ জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামের সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন।

আজ মুসলিম উম্মাহ্ যদি ইসালমের নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বস্তুগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তাহলে দুনিয়ার কর্তৃত্ব মুসলিমদের হাতে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ্। বস্তুগত চাকচিক্যে সমাজ বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। সমাজের অস্তিত্ব নৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্ত্যের কাছে চাকচিক্য আছে, নৈতিকতা নেই। এই সভ্যতা বেশিদিন নেতৃত্বের আসনে থাকতে পারে না। তবে অধিকতর উন্নত নৈতিকতা ও মানবিক যোগ্যতা সম্পন্ন কেউ না আসা পর্যন্ত তারাই কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন থাকবে।

মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর যখন কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে ইহুদীরা মুসলিমদের কঠিন শত্রুতে পরিণত হল। কারণ তাদের বদ-স্বভাবের কেচ্ছা কাহিনীগুলো একে একে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল জিবরাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর অহীর মাধ্যমে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শেষ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সেই ইশারা দিয়ে সতর্ক থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেদিনের সেই ইহুদী চক্রান্ত আজও চলে আসছে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে, আপনাকে তথা মুসলিম উম্মাহ্কে বিশ্বজোড়া মুশরিকী ও ইহুদী চক্রান্ত হতে হেফাজত করুন — আমীন।

গ্রন্থসূত্র :—

১। ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি - আল্লামা মাও মাওদুদি।

২। মুসলিম যুব সমাজের ক্যারিয়র গঠন — এ.ডি.মহ: ইউনুস, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা।

৩। The daily Telegraphs 26.03.2004 (Report of Janathan Petry)

৪। Report of Dr. Akram Nadvi - Research of Oxford Islamic Centre.

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দাওয়াতের বিরোধিতার কৌশল নির্ণয়ের জন্য কার বাড়িতে বৈঠক বসেছিল?

উ:— অলীদ বিন মুগীরাহ্‌র গৃহে।

২। প্রশ্ন ঃ উক্ত বৈঠকে কী কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল?

উঃ— মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আশ্রয়দাতা আবু তালেবকে বাপদাদার ধর্মের দোহাই দিয়ে ও সামাজিক ঐক্যের কথা বলে মুহাম্মাদকে বিরত রাখার দাবি জানানো এবং আগামী হজ্জ মৌসুমে শত মুখে তাঁকে জাদুকর বলে প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সর্বপ্রথম 'জাদুকরের' অপবাদ কে দিয়েছিল এবং কেন?

উঃ— অলীদ বিন মুগীরা। কেননা তার কথা যেই-ই মন দিয়ে শুনে তার মধ্যে জাদুর মত আসর করে (৭৪:২৪) এবং লোকেরা তার দলে ভিড়ে যায়।

৪। প্রশ্ন ঃ 'জাদুকরের' মিথ্যা অপবাদ প্রচারের জন্য তারা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

উঃ— 'জাদুকরের' মিথ্যা অপবাদ প্রচারের জন্য লোক নিয়োগ করেছিল। যেন তারা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে।

৫। প্রশ্ন ঃ অলীদ কে ছিলেন এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ কী বলেছেন?

উঃ— অলীদ বিন মুগীরা আল মাখযুমী ছিলেন মক্কার অন্যতম সেরা ধনী। আল্লাহ্ তাঁকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। তিনি নিজেকে বলতেন অহীদ ইবনুল অহীদ (আমি অদ্বিতীয়ের পুত্র অদ্বিতীয়)। আল্লাহ্ বলেন, 'ছাড় আমাকে এবং যাকে আমি একাই সৃষ্টি করেছি' (৭৪:১১)।

৬। প্রশ্ন ঃ অলীদ বিন মুগীরার ধন সম্পদ কীরূপ ছিল? তাঁর ধন সম্পদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা কী বলেছেন?

উঃ— তাঁর ফসলের ক্ষেত, পশুচারণ ক্ষেত্র ও বাগ-বাগিচা মক্কা হতে ত্বায়েফ পর্যন্ত (প্রায় ৯০ কিমি) বিস্তৃত ছিল। শীত, গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে তাঁর ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আয়-আমদানী অব্যাহত থাকত। তাঁর সন্তান-সন্ততি তাঁর সাথেই থাকত। আল্লাহ্ বলেন, ''আমি তাকে দিয়েছিলাম প্রচুর ধনসম্পদ এবং সদা সঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছিলাম প্রচুর সচ্ছলতা (৭৪:১২)।

৭। প্রশ্ন ঃ অলীদ বিন মুগীরা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট কুরআন শ্রবণ করলে আবু জাহাল অলীদ বিন মুগীরাকে কী বলেছিল?

উঃ— আবু জাহাল বলেছিল, আপনি তার ব্যাপারে এমন কিছু বলুন যাতে আপনার সম্প্রদায়ের লোক বোঝে যে, মুহাম্মাদ যা বলছে আপনি তা অস্বীকারকারী।

৮। প্রশ্ন ঃ আবু জাহালের উক্ত মন্তব্যে অলীদ কী বলেছিল?

উঃ— আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি যা বলেন সে বিষয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করেছি, এটি কোনো কবিতা নয়। নিশ্চয়ই এটি বিজয়ী হবে, বিজিত হবে না। আর আমি যা সন্দেহ করি তা এই যে, এটি জাদু (তাফসীর ইবনু কাসীর সূরা মুদাস্‌সির ১৮-২৪ নং আয়াত, ইবনু হিশাম ১/২৭০-২৭১ পৃঃ)।

৯। প্রশ্ন ঃ অলীদের অহংকার ও কুরায়েশ নেতাদের চাপে পড়ে হককে স্বীকার করার পরও অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণের কথা কোন সূরায় উল্লেখিত হয়েছে?

উঃ— সূরা মুদাস্‌সিরের ১৮-২৫ নং আয়াতে 'সে চিন্তা করল ও মনস্থির করল', 'অতঃপর সে তাকালো', 'অতঃপর ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল', 'অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল ও অহংকার করল', 'তারপর বলল, অর্জিত জাদু বৈ কিছু নয়'। এটা মানুষের উক্তি বৈ কিছুই নয়।

১০। প্রশ্ন ঃ অলীদ বিন মুগীরার 'জাদুকরের মিথ্যা অপবাদের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ কী বলেন?

উঃ— 'ধ্বংস হোক সে কীরূপ মনস্থির করল?' 'ধ্বংস হোক সে কীরূপ মনস্থির করল' (৭৪ : ১৯-২০)।

১১। প্রশ্ন ঃ মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য অলীদ বিন মুগীরার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলেছেন?

উঃ— সত্বর আমি তাকে 'সাকার' নামক জাহান্নামে প্রবেশ করাবো (৭৪:২৬)।

১২। প্রশ্ন ঃ অলীদ বিন মুগীরা কত বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন ও কোথায় সমাহিত হন?

উঃ— হিজরতের তিন মাস পর ৯৫ বছর বয়সে কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন এবং হাজুনে সমাহিত হন।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ গরুর দুধে উপকার আছে এবং তার মাংস ক্ষতিকর মর্মে কোনো হাদীস আছে কি? যদি থাকে তবে তার বিশুদ্ধতা ও ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন। — আবূ ফাহীম, ভগবানগোলা ও মুহাঃ জহিরউদ্দিন আহমেদ, দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা।

উত্তর ঃ গরুর দুধে উপকার ও মাংসে ব্যাধি মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলি যঈফ ও জাল। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘তোমরা গরুর দুধ ও ঘি ধারণ কর ও তার মাংস থেকে বিরত থাক। কারণ, তার দুধ ও ঘিয়ে প্রতিষেধক ও আরোগ্য রয়েছে এবং তার মাংসে ব্যাধি রয়েছে’’ (মুস্তাদরাক ৮২৩২)। ইমাম হাকিম বলেছেন, এ হাদীসের সনদ সহী। ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদে বলেছেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ‘সাইফ’ অত্যন্ত যঈফ। এমনকী ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, ‘সাইফ বিন মিসকীন’ হাদীস উলোট পালট করে দিত এবং জাল বর্ণনা করত। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় (আল মাজরূহীন ৪৪৬)।

ইমাম ইবনু কাইসারানী বলেন, এই সাইফ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের নাম দিয়ে জাল হাদীস বর্ণনা করত। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয় (তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১৫৮)। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী অত্র হাদীসের সনদে আরো দুটি দোষ বর্ণনা করেছেন। তা হল মাসঊদীর মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া এবং আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ ও তার পিতার মাঝে বিচ্ছিন্নতা। এরপরেও তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন তার সাক্ষীমূলক হাদীস থাকার কারণে। আমরা বলছি, এক্ষেত্রে তার বিচ্যুতি ঘটেছে। কেননা জাল হাদীসের বর্ণনাকারীর হাদীসকে কোনো হাদীসের সাক্ষীমূলক হিসাবে পেশ করা যাবে না। এ বিষয়ে আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সহ কোনো মুহাদ্দিসেরই দ্বিমত নেই। মুদ্দা কথা এ সূত্রে হাদীসটি জাল।

দ্বিতীয় হাদীস মুলাইকা বিনতু আমর দ্বারা বর্ণিত (তাবারানী কাবীর ৭৯)। তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে সে সাহাবীয়া নাকি তাবিয়িয়া। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটিকে তাঁর মারাসীলে বর্ণনা করেছেন (মারাসীল ৪৫০)। আর বিরাট সংখ্যক মুহাদ্দিস এবং অনেক ফকীহ ও উসূলবিদ্দের নিকটে মুরসাল হাদীস যঈফ, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না (মানহাজুন্ নাকদ্ ফী উলূমিল হাদীস ১/৩৭১)।

তৃতীয় হাদীস সুহাইব আল খাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বারা বর্ণিত (আত্ তিব্বুন নাবাবী আবূ নূআইম ৩২৫)। এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুসা বিন মুহাম্মাদ আন্ নাসাঈ অজ্ঞাত এবং দাফ্ফা বিন দাগফাল আস্ সাদূসী যঈফ (তাকরীবুত্ তাহযীব ১৮২৭)। এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ইবনু দাগফালের কেউ সমর্থন করেনি। সুতরাং ডাঃ খালিদ মাহমূদ আলহাইক হাদীসটিকে মুনকার বলে আখ্যায়িত করেছেন (আশীফ মুনতাদা : ৩/১৫৭১০)।

চতুর্থ হাদীস ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বারা বর্ণিত (কামিল ৭/৩০০)। এ হাদীসটি জাল। কেননা এ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আত্ তাহ্হানকে ইমাম আহমাদ মহা মিথ্যুক হাদীস জালকারী বলেছেন এবং ইমাম ইবনু মাঈন, আবূ যুরআ ও দারাকুতনী প্রমুখ ইমামগণ তাকে মহা মিথ্যুক বলেছেন (মিযানুল ইতিদা ৭৫৪৭)।

মুদ্দা কথা গোমাংসে ব্যধি আছে মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলি যঈফ ও জাল। সুতরাং ইমাম ইবনুল জাওযী, ইবনু কাইসারানী, ইবনুল কায়্যিম, ইবনু হাজার আসকালানী, সুলাইমান আলওয়ান, শুআইব আরনাঊত এবং ইবনু উসাইমীন প্রমুখ ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসগুলিকে যঈফ, জাল, অপ্রমাণিত এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেছেন। গোমাংসে কোনো ক্ষতি নেই , বরং উপকার রয়েছে যেমন তার দুধে উপকার আছে। সুতরাং সমস্ত মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ-এর নিকটে গোমাংস বৈধ। আল্লাহ তাআলা শস্য, ফল-ফলাদির ন্যায় গোমাংসও খাদ্যের তালিকায় রেখেছেন (সূরা আনআম ৬:১৪১-১৪৬)। আল্লাহ্ তাআলা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি অ সাল্লাম) এর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَٰٓئِثَ (সূরা আরাফ ৭:১৫৭)। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) এ আয়াতে ‘ত্বয়্যিবাত’ ও ‘খাবাইস’ এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক উপকারী জিনিস পবিত্র এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর জিনিস অপবিত্র (মাজমূ ফাতাওয়া ২১/৫৪০, ফাতাওয়া কুবরা ১/৩৭২)। অর্থাৎ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) উপকারী পবিত্র জিনিস বৈধ করেন এবং ক্ষতিকর অপবিত্র জিনিস অবৈধ করেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু

আল্লাইহি অ সাল্লাম) নিজ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন (বুখারী ২৯৪, মুসলিম ১২১১, ইবনু মাজাহ্ ২৯৬৩)। এ থেকেও প্রতীয়মান হল যে, 'গরুর মাংসে ব্যাধি আছে' কথাটি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ তাতে ব্যাধি থাকলে তিনি তা কুরবানী করতেন না এবং আল্লাহ্ তাআলাও গোমাংস আহারের নির্দেশ দিতেন না।

২। প্রশ্ন ঃ স্বলাতে পবিত্র কুরআন পাঠের সময় ধারাবাহিকতা রাখা কি অপরিহার্য নাকি আগে-পিছে পড়া যায়? যেমন প্রথম রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়লে দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ফালাক কিংবা সূরা নাস পড়তে হবে। কিন্তু সূরা ফালাক পড়ে সূরা ইখলাস কিংবা সূরা কাওসার পড়া যাবে না? — নাসিমা, বরোজ।

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনে যেভাবে সূরাগুলির বিন্যাস রয়েছে সেভাবেই পাঠ করা উত্তম। তবে কেউ যদি সূরা ফালাক পড়ে দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস কিংবা সূরা কাওসার পড়ে তবে তা জায়েয (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৪/১৭, মাওকাউল ইসলাম ৫/১৭০২)। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাতে আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে স্বলাত আদায় করেছি। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সূরা বাক্বারাহ্ পড়লেন, তারপর সূরা নিসা পড়লেন, অতঃপর সূরা আলে ইমরাণ পড়লেন (মুসলিম ৭৭২, আহমাদ ২৩৩৬৭)।

৩। প্রশ্ন ঃ প্যান্ট, পায়জামা ও জামার হাত গুটিয়ে স্বলাত আদায় করার বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন। — বাদরুদ্দীন, খোশবাসপুর, কান্দী।

উত্তর ঃ প্যান্ট, পায়জামা ও জামার হাত গুটিয়ে স্বলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) 'কাপড়' গুটিয়ে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (বুখারী ৮১২, মুসলিম ৪৯০, আহমাদ ২৫২৭)। এ হাদীসের ভাষ্যে ইমাম নাওবী বলেছেন, সমস্ত আলেমের ঐক্যমতে কাপড় গুটিয়ে তথা প্যান্ট, পায়জামা ও জামার হাত গুটিয়ে স্বলাত আদায় করা নিষিদ্ধ (শার্হুন নাওবী ৪/২০৯, আওনুল মা'বূদ ৩/১১৩, ফাতাওয়া শাবাকাতে ইসলামিয়্যা ১১/৬৯৭৭)। এ বিষয়ে আল্লামা আইনী হানাফী ও সমস্ত ইসলামী পন্ডিতের ঐক্যমত নকল করেছেন (উমদাতুল কারী ৬/৯১)।

প্রকাশ থাকে যে, অহংকার করে হোক অথবা অহংকার না করে হোক উভয় অবস্থাতেই পুরুষদের জন্য গাঁটের নীচে কাপড় যথা প্যান্ট, পায়জামা ও জুব্বা পরা হারাম। জাবির বিন সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বারা বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমার কাপড় পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠিয়ে রাখো, যদি মানতে না চাও তবে টাখনু পর্যন্ত রাখো। টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরা হতে সাবধান; কারণ তা করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ অহংকার পছন্দ করেন না" (আবূ দাউদ ৪০৮৪, আহমাদ ১৬৬১৬)। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ কিয়ামতের দিবসে তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। (তারা হল) দান করার পর তার খোঁটা দানকারী, নিজের পণ্য দ্রব্য মিথ্যা শপথ করে বিক্রয়কারী এবং পায়ের গোড়ালির নীচে কাপড় পরিধানকারী" (মুসলিম ১০৬, নাসাঈ ২৫৬৪, ৫৩৩৩, আহমদ ২১৪০৪)।

৪। প্রশ্ন ঃ তাশাহ্হুদের বৈঠকে দৃষ্টি কোথায় থাকবে বিশুদ্ধ দলীলের মানদণ্ডে দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন? — রেহসান, জিগরী, ফারাক্কা।

উত্তর ঃ তাশাহ্হুদের বৈঠকে দৃষ্টি তর্জনী আঙ্গুলের উপর থাকবে। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তাশাহ্হুদে বসতেন তখন তাঁর ডান হাত ডান রানের উপর এবং বাম হাত বাম রানের উপর রাখতেন এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন। আর তাঁর দৃষ্টি ইশারা থেকে অগ্রসর হত না (আহমাদ ১৬১০০, নাসাঈ ১২৭৫, আবূ দাউদ ৯৯০, হাদীস সহীহ)। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসের সনদকে হাসান সহীহ্ বলেছেন (সহীহ্ আবূ দাউদ ৯১০)। আল্লামা আব্দুল কাদির আরনাঊত এবং শুআইব আরনাঊত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (জামিউল উসূল, টীকা নং ৩, আহমাদ, টীকা নং ১)। ইমাম নাওবী এ হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলেছেন (খুলাসাতুল আহকাম ১৩৮৯) এবং হাফিয যুবাইর, হুসাইন সালীম ও আ'যামী প্রমুখগণ হাদীসের তাহকীকে হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন। কেউই হাদীসটিকে যঈফ বলেননি; বরং সকলের ঐক্যমতেই হাদীস সহীহ্।

৫। প্রশ্ন ঃ মসজিদের ইমাম না থাকা অবস্থায় কুরআন জানা ব্যক্তিরা ইমামতি করে না। তাদের যুক্তি হল মসজিদ বা গ্রামের দায়িত্বশীলরা যেহেতু কুরআন ও হাদীস না জানা সত্ত্বেও দায়িত্ব চালাচ্ছে, সেহেতু তাদের মসজিদের ইমামতিও করতে হবে। এক্ষেত্রে কুরআন জানা ব্যক্তিদের যুক্তি কি সঠিক দলীল

সহ জানিয়ে বাধিত করবেন ?— ইসলামী লাইব্রেরী, কাঁকুড়িয়া, উমরপুর।

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে কুরআন জানা ব্যক্তিদের যুক্তি সঠিক নয়। কেননা দায়িত্ব পরিচালনা করা এক জিনিস, আর ইমামতি করা আর এক জিনিস। মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হওয়ার জন্য কুরআন জানা আবশ্যিক নয়; বরং মুসলিম হওয়া অপরিহার্য (তাফসীরে কুরতুবী ৮/৮৯, আওযাহুত্ তাফাসারী ১/২২৪, মাআরিফুল কুরআন, সূরা তাওবাহ্র ১৭ ও ১৮ নং আয়াতের ভাষ্য)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যদি তিন ব্যক্তি হয় তবে তাদের মধ্যে একজন ইমামতি করবে। আর ইমামতির বেশি হকদার সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে বেশি কুরআন পড়তে পারে'' (মুসলিম ৬৭২, নাসাঈ ৭৮২, আহমাদ ১১১৯০)। আবূ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''লোকেদের ইমাম সেই ব্যক্তি হবে যে বেশি কুরআন পড়তে পারে'' (মুসলিম ৬৭৩, ইবনু মাজাহ্ ৯৮০, আবূ দাউদ ৫৮২)।

সুতরাং আমর বিন সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বেশি কুরআন জানা থাকার কারণে তাঁর এলাকার সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁর ইমামতিতে স্বলাত আদায় করতেন। অথচ সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছরের মতো (বুখারী ৪৩০২, আবূ দাউদ ৫৮৫)।

বিঃদ্রঃ- একজন মুসলিমের কুরআন পড়তে না জানা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়।

৬। প্রশ্ন ঃ জুমুআর খুৎবার জন্য মেম্বারে বসার আগে সালাম দেওয়ার বিধান কী? ও কখন সালাম দিবেন — মেম্বারে চড়ে বসার আগেই নাকি বসে দাঁড়ানোর পরে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — আবুল হাসান, সুতী, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ মিম্বারে চড়ে উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে মুখ করে বসার আগে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব (মাজমূ' শার্হুল মুহায্যাব ৪/৫২৭, মুগনী ইমাম ইবনু কুদামা ২/২১৯)। জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মিম্বারে উঠে সালাম দিতেন (ইবনু মাজাহ ১১০৯, বাইহাকী ৫৭৪১)। এ হাদীসের সনদ ইবনু লাহীআহ্র কারণে যঈফ। কিন্তু এর সাক্ষীমূলক হাদীস এবং একাধিক সাহাবার আসার থাকার কারণে আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (তাহ্কীক্ ইবনু মাজাহ্ ১১০৯, সিলসিলাতুল আহাদীসিস্ সাহীহাহ্ ২০৭৬)।

৭। প্রশ্ন ঃ একজন ইমাম ইকামতের পরে মুক্তাদীদের বলেন, আপনারা লাইন সোজা করে নিন, আপনারা মনে মনে তাকবীর বলবেন। ইকামতের পরে ইমাম সাহেবের একথা বলা যে, আপনারা মনে মনে তাকবীর বলবেন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিশুদ্ধ দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন। কেননা তিনি একথা প্রত্যেক স্বলাত শুরুর আগে বলেন। — যিয়াউর রহমান, আমিত্যা, কান্দি।

উত্তর ঃ ইকামতের পর ইমাম সাহেব লাইন সোজা করা সংক্রান্ত বিষয়ে বলবেন যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলতেন, سُوُّوا صُفُوفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ (বুখারী ৭২৩, মুসলিম ৪৩৩)। বারা বিন আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে আমাদের বুক ও কাঁধ সোজা করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা কাতারে বাঁকা হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের হৃদয়ে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে (আবূ দাউদ ৬৬৪, নাসাঈ ৮১১)। নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা স্বলাতের জন্য দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমাদের কাতার সমূহ সোজা করে দিতেন। অতঃপর আমরা সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তাকবীর বলতেন (আবূ দাউদ ৬৬৫, বাইহাকী ২২৯১)।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হল যে, লাইন সোজা হলে ইমাম তাকবীর বলবেন। কিন্তু এ সময় মোক্তাদীদের মনে মনে তাকবীর বলতে বলা কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। লাইন সোজা করতে বলা ছাড়া ইমামের এ সময় অন্য কথা বলা ঠিক নয়। যেমন সৌদী ফাতাওয়া কমিটির মুফতীগণ লাইন সোজা করা সংক্রান্ত বিষয়টি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত করে বলেন, ইমাম সাহেবের কথা ''তোমরা স্বলাত আদায় কর যেন এটাই শেষ স্বলাত, একাগ্রচিত্তে স্বলাত আদায় কর এবং বিনম্রশীলতার সাথে স্বলাত আদায় কর প্রভৃতি উপদেশ তাকবীরে তাহরীমার আগে শরীয়ত সম্মত নয়; বরং তা বিদ্‌আত'' (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৬/৩২৭-৩২৮)।

সংগঠন সংবাদ

বিগত ১১.০৬.১৭ তারিখ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলার আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব সূরা্ রুমের ২০-২৬ নং আয়াতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। উক্ত আয়াতগুলোর তাৎপর্য বিশ্লেষণে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র অনেক নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল তিনি মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর একটি নিদর্শন হল পুরুষ হতেই নারীর সৃষ্টি এবং সেই নারীর কাছ থেকে প্রেম ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। আল্লাহ্‌র আর একটি নিদর্শন হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতা। তাছাড়া রাত্রে ও দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য নিদ্রার ব্যবস্থা এবং দিবাভাগে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ। শুধু তাই নয়, আশঙ্কা ও আশা স্বরূপ বিদ্যুৎ প্রদর্শন এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ ও তা দিয়ে ভূমিকে মৃত্যুর পর জীবিত করা। আল্লাহ্‌র আরও একটি নিদর্শন হল তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি এবং তাঁরই আদেশে মাটি হতে উত্থিত হওয়া। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ। যেমন জীবন মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, সম্মান অসম্মান সবই তাঁর নিয়ন্ত্রাধীন।

অতএব আল্লাহ্ প্রদত্ত এত নেয়ামত ও অনুগ্রহ পাওয়ার পরও আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দাওয়াতী ও তাবলিগের কাজই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানেও আমাদের ত্রুটি। পৃথিবীতে সমস্ত নাবী ও রসূলদের আল্লাহ্ তাআলা উক্ত কাজের জন্যই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। উক্ত কাজে সক্রিয়তা প্রদর্শনে আল্লাহ্ প্রদত্ত পুরস্কার হল নাবী, রসূল, সিদ্দীক ও শোহাদাদের সঙ্গে সহবস্থানের সৌভাগ্য অর্জন। অতএব আসুন দাওয়াত ও তাবলীগী কাজে আরও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে আপ্রাণ চেষ্টা করি। দুআ করি আল্লাহ্ যেন উক্ত কাজে আরো সক্রিয় হওয়ার তাওফীক দান করেন — আমীন

আলোচ্য সূচী অনুযায়ী মিটিং-এ যে সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয় তা হল ঃ—

(১) প্রতিটি ব্লকের দায়িত্বশীলদের আগামী জুলাই মাসের মাসিক সভায় পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট পাঁচ হাজার করে টাকা জেলা জমঈয়ত অফিসে জমা করতে হবে।

(২) ২০১৭ সালে হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট দিনে অথ্যাৎ ৯ই জুলাই রবিবার প্রতিটি হজ্ব গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের হাতে আব্দুল হামীদ মাদানী কর্তৃক লিখিত হজ্ব ও উমরাহ' নামক বইটি দেওয়া হবে যা সরবরাহ করবেন ইমাম হোসেন।

বিবিধ বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি হল —

(ক) আগামী জুলাই ২০১৭ থেকে দাওয়াতী কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়া ব্লকে জেলা নির্দিষ্ট কিছু দাঈর মাধ্যমে শুক্রবার জুমআর খুতবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমে উৎসাহিত করা হবে। উক্ত কাজে অংশ গ্রহণকারীরা হলেন যথাক্রমে - (১) আব্দুল্লাহ্ সালাফী, (২) নাজমে আলাম সানাবিলী, (৩) জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট দাঈ, (৪) আইনুল হক এবং (৫) মোঃ কুতুবুদ্দিন।

এছাড়া উক্ত কার্যক্রমে আরও যাঁরা থাকছেন তারা হলেন — (১) আনওয়ারুল হক ফাইযী, লালগোলা ব্লক, (২) তাজাম্মুল হক সালাফী, মুক্তারপুর, (৩) আবু ফায়সাল সালমান, নওদা, (৪) হেলালুদ্দীন, নজরানা, (৫) ইমাম হোসেন, ডোমকল।

(খ) জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস মুর্শিদাবাদ অফিসে সার্বক্ষণিক একজন কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ দাঈ নিয়োগ করা হবে। উক্ত যোগ্য লোকের অনুসন্ধান জেলার প্রতিটি কর্মীর উপর বহাল থাকল।

এরপরেই আমীর সাহেবের দুআ পাঠের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সভার কাজের সমাপ্তি ঘটে। ইতি —

জেলা সম্পাদক

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই জুলাই -১৫ই আগষ্ট)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬	৩:৩৪	৪:৫৮	১১:৪৪	৩:০৫	৬:২৮	৭:৫৩
১৭	৩:৩৪	৪:৫৯	১১:৪৪	৩:০৬	৬:২৭	৭:৫৩
১৮	৩:৩৫	৪:৫৯	১১:৪৪	৩:০৬	৬:২৭	৭:৫২
১৯	৩:৩৬	৫:০০	১১:৪৪	৩:০৬	৬:২৭	৭:৫২
২০	৩:৩৬	৫:০০	১১:৪৪	৩:০৬	৬:২৬	৭:৫১
২১	৩:৩৭	৫:০১	১১:৪৪	৩:০৭	৬:২৬	৭:৫১
২২	৩:৩৮	৫:০১	১১:৪৪	৩:০৭	৬:২৬	৭:৫০
২৩	৩:৩৮	৫:০২	১১:৪৪	৩:০৭	৬:২৫	৭:৫০
২৪	৩:৩৯	৫:০২	১১:৪৪	৩:০৭	৬:২৫	৭:৪৯
২৫	৩:৪০	৫:০২	১১:৪৪	৩:০৮	৬:২৪	৭:৪৯
২৬	৩:৪০	৫:০২	১১:৪৪	৩:০৮	৬:২৪	৭:৪৯
২৭	৩:৪০	৫:০৩	১১:৪৪	৩:০৮	৬:২৪	৭:৪৮
২৮	৩:৪২	৫:০৪	১১:৪৪	৩:০৮	৬:২৩	৭:৪৭
২৯	৩:৪২	৫:০৪	১১:৪৪	৩:০৮	৬:২২	৭:৪৬
৩০	৩:৪৩	৫:০৫	১১:৪৪	৩:০৮	৬:২২	৭:৪৫
৩১	৩:৪৩	৫:০৫	১১:৪৪	৩:০৯	৬:২১	৭:৪৪
১ আগষ্ট	৩:৪৪	৫:০৬	১১:৪৪	৩:০৯	৬:২১	৭:৪৪
২	৩:৪৫	৫:০৬	১১:৪৪	৩:০৯	৬:২০	৭:৪৩
৩	৩:৪৫	৫:০৭	১১:৪৪	৩:০৯	৬:২০	৭:৪২
৪	৩:৪৬	৫:০৭	১১:৪৪	৩:০৯	৬:১৯	৭:৪১
৫	৩:৪৭	৫:০৭	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৮	৭:৪০
৬	৩:৪৭	৫:০৮	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৮	৭:৩৯
৭	৩:৪৮	৫:০৮	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৭	৭:৩৮
৮	৩:৪৯	৫:০৯	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৬	৭:৩৮
৯	৩:৪৯	৫:০৯	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৬	৭:৩৮
১০	৩:৪৯	৫:০৯	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৬	৭:৩৭
১১	৩:৫১	৫:১০	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৪	৭:৩৫
১২	৩:৫১	৫:১০	১১:৪৩	৩:০৯	৬:১৪	৭:৩৪
১৩	৩:৫২	৫:১১	১১:৪২	৩:০৯	৬:১৩	৭:৩৩
১৪	৩:৫২	৫:১১	১১:৪২	৩:০৯	৬:১২	৭:৩২
১৫	৩:৫৩	৫:১২	১১:৪২	৩:০৯	৬:১১	৭:৩১

মাসিক "সরল পথ" ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা • শওয়াল - ১৪৩৮ • জুলাই - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

মূল্য - ১৮/- টাকা মাত্র
Printed by : S.F. Printers, Beldanga, Mob : 9434531957